৬ দফা দাবিতে রাজ্য জুড়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ সভা

রাজ্য জুড়ে সরকারী কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবার শপথ নিল

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করা, অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, প্রশাসনিক সন্ত্রাস ও দমনপীড়নমূলক বদলি বন্ধ করা, সর্বস্তরে শূন্যপদ পূরণ, ডেয়ারীর বেসরকারীকরণের উদ্যোগ বাতিল করা সহ ছয় দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ৯ জুন ২০১৫ রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং কলকাতার ৬টি অঞ্চলে (একটি অঞ্চল অনিবার্য কারণে ২ জুন করেছে) জমায়েত ও বিক্ষোভে সভার কর্মসূচীতে বিপুলভাবে সাড়া দিল রাজ্যের কর্মচারী সমাজ। উল্লেখ্য যে বিগত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-র জমায়েত কর্মসূচীর যে পাঁচ দফা দাবি তার সাথে ডেয়ারী বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে দাবিটি যুক্ত হয়েছিল। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যখন বিভিন্ন স্তরে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তখনই কর্মচারীরা যেভাবে সারা দিয়েছিলেন তাতে এটা বোঝা গেছিল যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য কর্মচারীরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। গত মে মাসে প্রতিটি জেলায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ব্লকস্তর অবধি সফর করেছেন। অঞ্চলেও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ প্রচারে গেছেন। পরবর্তীকালে জেলা ও অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে ইউনিটস্তর অবধি বিভিন্ন ধারার প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রচারে গিয়ে এটা অনুভূত হয়েছে যে, বর্তমান সরকারের চার বছরের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা মুখিয়ে আছেন আরও বড় কর্মসূচীর দিকে। ৯ জুনের জেলা জমায়েত কেন্দ্র করে কোন কোন জেলার কর্মচারীদের উৎসাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে শুধু জেলা কেন্দ্রে নয়, মহকুমাগুলিতেও জমায়েত কর্মসূচী করতে বাধ্য হয়। জেলা নেতৃত্ব সব জেলায় অধিকাংশ কর্মচারীরা অর্ধ দিবস, পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে দূর দূরান্তের ব্লকগুলি থেকে জমায়েতে হাজির হয়েছেন। এমনকি বিরোধী সংগঠনের সদস্যরাও এসেছেন জমায়েত কর্মসূচীতে। তারা স্বীকার করেছেন দাবি দাওয়া আদায় করতে গেলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকেই উদ্যোগী হতে হবে।

পুরুলিয়া জেলা সমাবেশের একাংশ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সমাবেশের একাংশ

জমায়েত কর্মসূচীতে এমন অনেক সদস্য হাজির হয়েছিলেন যাঁরা এতদিন নানাবিধ কারণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সংগ্রামের ময়দানে হাজির হতেন না। সামগ্রিকভাবে বলা যায় ৯ জুন ২০১৫ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে গোটা রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সমাজ। তাই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে একটাই স্লোগান উঠে এসেছে গোটা রাজ্য জুড়ে। সেটা হল বৃহত্তম পর্যায়ের কর্মসূচী প্রয়োজন। প্রয়োজনে ধর্মঘট করেই কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার প্রতি উদাসীন এই সরকারকে নাড়া দিতে হবে। মে ২০১১-তে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে দুর্বল করার নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে নানা দিক থেকে। সংগঠন দপ্তরের উপর আক্রমণ এবং দপ্তর দখল, নেতা কর্মীদের উপর দৈহিক আক্রমণ, মিথ্যা মামলায় নেতা কর্মীকে ফাঁসানো, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারগুলি ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া এবং বেছে বেছে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের দূর দূরান্তে বদলি ইত্যাদি নানাবিধ আক্রমণ সত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে আন্দোলন সংগ্রামের পথ থেকে সরানো যায়নি। সংগঠনকে দুর্বলও করা যায়নি। এমনকি রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নজিরবিহীন ভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেবার আহ্বান

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করুন

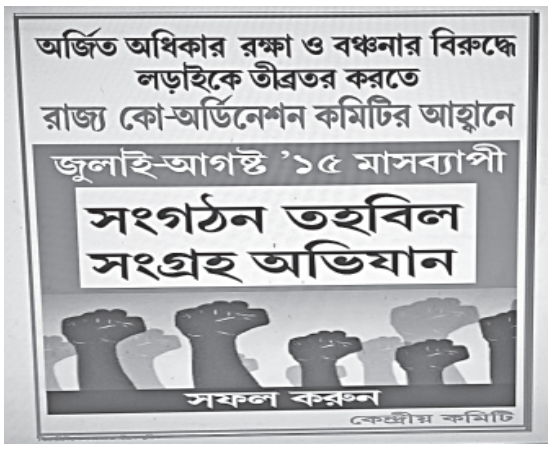

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। রাজ্য কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন। শুরু থেকেই, আজও। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে প্রায় ষাটটা বছর। এত দীর্ঘ সময় ধরে বৃহত্তম সংগঠনের শিরোপা রয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দখলে। কেউ কেড়ে নিতে পারেনি, কেড়ে নেওয়ার ন্যূনতম সম্ভাবনাও কেউ তৈরি করতে পারেনি। কেন? একি এমনি এমনিই? বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারল কেন? কেন, রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের সিংহভাগই আঁকড়ে ধরলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে? কেন মনে করলেন ভরসা করা যায় শুধুমাত্র আন্দোলনের এই মঞ্চটিকেই?

এর কারণ জড়িয়ে রয়েছে সংগঠনের দীর্ঘ ছয় দশকের পথ চলার প্রতিটি পর্বে। আসলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাফল্যের, তার কার্যকারিতার মূল মন্ত্র হল—যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে কর্মচারী স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে জান কবুল লড়াই করতেই হবে। প্রশাসন কেমন, তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সংগঠনের কর্মসূচীর 'ফর্ম', কার্যক্রমের জঙ্গীপনা নির্ভর করবে এটা ঠিকই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কর্মচারী স্বার্থকে 'কম্প্রোমাইজ' করা হবে না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে এ শুধু আপ্তবাক্য নয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে বোঝা যায়, মুহূর্তের জন্যও সংগঠন এই দিশা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

সংগঠনের জন্মই হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। বলা ভালো প্রতিকূলতায় ভয়ঙ্কর অভিঘাত এমন একটি সংগঠনের জন্মের অবশ্যম্ভাবী অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। তখন কেমন ছিল একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীর জীবন? কি পেতেন তাঁরা? কিছুই না। মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন এসব ছিল কল্পনারও বাইরে। ছিল না কোনো অধিকার, কোন মর্যাদা। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে সারাদিন দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হত। তাঁদের বসার জন্য একটা টুল পর্যন্ত থাকতো না দপ্তরে। পাঁচের দশকের শেষ পর্বে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—'একজন কর্মচারী অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় ধূপ বিক্রী করতেন।' এমনই ছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক দূরাবস্থা। এই পরিস্থিতিতে ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি প্রথম উত্থাপন করেছিল কোন্ সংগঠন? উত্তর—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কর্মচারীদের উৎসব অগ্রিম ও বোনাস দিতে হবে—মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সামনে এই দাবি পেশ করেছিল কোন সংগঠন? উত্তর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। গত শতাব্দীর সাতের দশকে ভয়ঙ্কর আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস মোকাবিলায় যে ৬০ জন কর্মী-কর্মচারীর বুকের রক্তে লাল হয়েছিল পশ্চিমবাংলার মাটি—তাঁরা কোন সংগঠনের পতাকা কাঁধে নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন? উত্তর, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ঐ সময়েই কোন্ সংগঠনের নেতাদের বরখাস্ত হতে হয়েছিল, কারাবরণ করতে হয়েছিল, অন্যায় বদলি হতে হয়েছিল, এলাকাচ্যুত হতে হয়েছিল? উত্তর সেই একই—

(সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

ঋণ গ্রহণে রেকর্ড সৃষ্টির পথে রাজ্য সরকার

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসকদলের সকলের মুখেই একটা কথা লেগে আছে যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের উপর ঋণের যে বোঝা চাপিয়ে গেছে, তা সুদে আসলে শোধ করতে গিয়েই নাকি সব টাকা চলে যাচ্ছে, উন্নয়নের কাজ করা যাচ্ছে না। এমনকি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতাও দেওয়া যাচ্ছে না। বিগত ৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ডা. সূর্যকান্ত মিশ্রের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা থেকে বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার চিত্রই ফুটে উঠেছে। 'ঋণের বোঝা' বর্তমান সরকার যে যেচে পড়ে ঝাঁধে চাপাচ্ছে তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিগত চার বছরে বর্তমান সরকার বাজার থেকে দেনা করেছে ৮৬ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা।

বিরোধী দলনেতা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে ঐদিন জানতে চেয়েছিলেন যে আর্থিক বছর ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫-তে রাজ্য সরকার বাজার থেকে কত ঋণ নিয়েছে। উত্তরে অমিত মিত্র বলেছেন যে, এর পরিমাণ হল ৬৩,৪০০ কোটি টাকা। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল পূর্ববর্তী সরকারের ঋণের সুদ ও আসল শোধের জন্য এই ঋণ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও যা বলেছেন তার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার যে পরিমাণ ঋণ নিত তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণ প্রতি বছর বাজার থেকে নিয়ে চলেছে বর্তমান সরকার। এই সময়ে গৃহীত ঋণের সুদ ও আসল বাবদ ইতিমধ্যেই সরকারকে ৭ হাজার কোটি টাকা গুণতে হয়েছে।

২০১০-১১-র বাজেট বিবৃতি অনুসারে রাজ্যের মোট পুঞ্জীভূত ঋণ সেই সময় ছিল ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা (প্রকৃত হিসাব)। পুঞ্জীভূত অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে জমা হতে থাকা সর্বমোট ঋণ। সেই হিসেবে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষ অর্থবর্ষের প্রকৃত পুঞ্জীভূত ঋণ। কেবলমাত্র ৩৪ বছরের পুঞ্জীভূত ঋণ নয়। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের এই ঋণের পরিমাণ (অনুমিত হিসাব) হবে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১-র ঋণের অর্থ এই ঋণ থেকে বাদ দিলে পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ হবে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা।

উল্লেখ্য যে, বামফ্রন্ট আমলে এমন অনেক কেন্দ্রীয় সুযোগ সুবিধা ছিল না যা বর্তমান রাজ্য সরকার পায়। যেমন বর্তমানে কেন্দ্রীয় ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী করে ২০ বছরে শোধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অনেক বেশি কিস্তিতে শোধের সুযোগ বর্তমান রাজ্য সরকার পাচ্ছে। তাছাড়া সুদের হারও কমানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী রাজ্যের স্বল্প

(সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট নয়া ইতিহাস রচনার পথে শ্রমিক কর্মচারীরা

আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রমণের মাঝে আবার ব্যবহার করতে হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সর্বোচ্চ হাতিয়ার 'ধর্মঘট' নামক অস্ত্রটিকে। গত ২৬ মে দেশের সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সমগ্র দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ১২ দফা দাবিতে স্তব্ধ করে দেবে গোটা দেশকে। কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের শ্রম আইন সংশোধনের অপপ্রয়াস বন্ধ এবং লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের পদক্ষেপ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত করার দাবি সহ ১২ দফা দাবিতে গত ৫ ডিসেম্বর '১৪ দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী আইন অমান্য কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কয়লা শিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, ব্যাঙ্ক, বিএসএনএল-এর কর্মচারীরা ধর্মঘট করে, ৩০ এপ্রিল '১৫ দেশের পরিবহণ শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘট করে—কিন্তু সরকার অনড়। তাই সি আই টি ইউ, বি এম এস, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, এ আই টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, এল পি এফ, এস ই ডব্লিউ এ, প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, বীমাসহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জুন-জুলাই মাস ব্যাপী রাজ্য-জেলা-শিল্প ভিত্তিক যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন

(সপ্তম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
জুন ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

যোগ-বিয়োগের অঙ্ক

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর স্বীকৃতি প্রদান করেছে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রতি বছর এই দিনটিতে যোগ দিবস প্রতিপালনের সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হবে। শোনা যাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ কথা শুনে আমাদের খুশি না হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যা বিস্ময়কর, তা হল প্রথম বছরেই এই দিনটি প্রতিপালনকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ হুজুক সরকারী উদ্যোগে প্রদর্শন করা হল এবং যে মাত্রায় সমস্ত গণমাধ্যমে প্রচার করা হল।

বিস্ময়কর, কারণ রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন দিন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস হিসাবে বহুদিন ধরেই প্রতিপালিত হয়ে আসছে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে সরকারী অনুষ্ঠানের আয়োজনও যে করা হয় না তা নয়। করা হয় এবং বহু ক্ষেত্রেই তা হয় কেবল আনুষ্ঠানিক। দিবস পালনের প্রকৃত মর্মবস্তুকে নিয়ে চর্চা বা প্রয়োগের তেমন কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে আমরা 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রতি বছর ৮ মার্চ এই দিনটি প্রতিপালিত হয়। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সমাজ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে নারী সমাজের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক সমস্যাগুলির নিরসনে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় কি? বা এমন হৈ হৈ, রৈ রৈ ব্যাপারও নজরে পড়ে না। সভা, সেমিনার, বক্তৃতাতেই দায় সারা হয়। আরও দু-একটি উদাহরণও আমরা যাচাই করে নিতে পারি। 'যোগ'-এর সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কারণ এটি শারীরবৃত্তীয় বিজ্ঞানসম্মত শরীর চর্চা। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার মধ্য দিয়েই এটা প্রথম জানা গেল তা নয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে যোগাভ্যাস প্রচলিত। কিন্তু প্রায় সমধর্মী আরও কয়েকটি দিবস রয়েছে। যেমন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' প্রভৃতি। পরিবেশকে রক্ষা করা না গেলে, দূষণের প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্যে পড়বেই। শত যোগেও তা দূর করা যাবে না। আর 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'-এর পরিধিটাও বেশ বড়। পর্যাপ্ত খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রভৃতি সবকিছুই এর সাথে যুক্ত। যা একটি সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত। অথচ এই দিবসটিও পালিত হয় প্রায় মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাতে মনসা পুজোর মতোই—নমঃ নমঃ করে। তাই বিস্মিতই হতে হয় যখন হঠাৎ করে 'যোগ দিবস' পালন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ গোটা মন্ত্রিসভা রাস্তায় নেমে পড়েন। যোগ গুরু রামদেবকে সাথে নিয়ে দিল্লীর রাজপথে প্রধানমন্ত্রীর 'শলভাসন' দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মিডিয়া।

আসলে হঠাৎ করে দেশবাসীকে যোগ-মাহাত্ম্যের বড়ি খাওয়ানোর প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যবিহীন তো নয়ই, এমনকি দেশবাসীর সুস্বাস্থ্যের কামনার মতো সহজ-সরল কোনো উদ্দেশ্যও নয়। একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে বোঝা যায় এর পিছনে কাজ করছে এক গূঢ় অভিসন্ধি এবং তা হল, 'হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক চর্চা'কে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসনটিতে আসীন হয়েছেন, সেই রাজনৈতিক দলটিকে পরিচালনা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। হিন্দুত্ববাদী ভাবধারা প্রচারের জন্য যে 'ক্যাডার বাহিনী' তৈরি করা হয়, তাদের শারীরিক অনুশীলনের অঙ্গ হল দৈনন্দিন ড্রিল, যোগ ব্যায়াম, লাঠি খেলা প্রভৃতি। অর্থাৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'যোগ' সম্পর্কে একটা কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে, কৌশলে আরএসএস-এর ক্যাডার পলিসিকে সর্বজনীনতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'গীতা'-র পাশাপাশি 'যোগ'কেও স্কুল শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসেবে যুক্ত করার সরকারী সদিচ্ছাও এই পরিকল্পনার অঙ্গ। এর আরও একটি দিকও রয়েছে। 'ঢাক-ঢোল' পিটিয়ে 'যোগ' দিবস প্রতিপালনের যে সরকারী উদ্যোগ, তাতে প্রকাশ্যে 'হিন্দু' বা 'হিন্দুত্ব' শব্দগুলি উচ্চারিত না হলেও, ধর্মীয় মেরুকরণের সুক্ষ্ম ও নমনীয় পরিকল্পনাও এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কারণ 'যোগ' শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলেও এর উৎস সন্ধান করলে জানা যায়, হাজার হাজার বছর ধরে 'আধ্যাত্মিক চর্চা'-র সাথে সম্পর্কিত এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি। অথচ হিন্দুত্ববাদীদের প্রাইম টার্গেট যে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ—সেই মুসলিম ও খ্রিস্টান জনসমাজে ধর্ম চর্চায় 'যোগ'-এর কোনো স্থান নেই। খবরে প্রকাশ সেদিন (২১ জুন) কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যরা 'যোগ' নিয়ে অতি উৎসাহ দেখালেও, উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি এই 'যোগসূয় যজ্ঞ' থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। 'যোগ দিবস' পালন আসলে 'এক ঢিলে তিন পাখি' মারার ব্লু-প্রিন্ট। আরএসএস-এর ক্যাডার পলিসিকে সর্বজনগ্রাহ্য করা, সুক্ষ্ম ধর্মীয় মেরুকরণ ছাড়াও তৃতীয় কারণ হল ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত মননের ফোকাসটাকে অক্ষরেখা থেকে বিচ্যুত করার একটি ডিপ্লোমেটিক উদ্যোগ। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সূচনা পর্ব থেকে ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বিশ্ব আর্থিক মন্দার ঠিক আগে পর্যন্ত, এদেশে বিলিওনিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে 'চুঁইয়ে পড়া' (ট্রিকল ডাউন) তত্ত্বে কিছুটা উপকৃত হয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজের একাশংও। জিডিপি ভিত্তিক উন্নয়নের যে মডেল, যেখানে উন্নয়ন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র জিডিপি-র হার বৃদ্ধি এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন। বিলিওনিয়ারের সংখ্যাবৃদ্ধি এই বৃক্ষেরই ফল। বর্ধমান বিলিওনিয়ারের চাহিদা পূরণে তৈরি হয় আইটি সেক্টরসহ বিস্তৃত পরিষেবা ক্ষেত্র। সৃষ্টি হয় 'হোয়াইট কলারড্ জব্স'। উপকৃত হয় মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত সমাজকে বাজারমুখী করার জন্য চালু করা হয় বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 'ক্রেডিট ফেসিলিটিজ'। তৈরি হয় প্রকৃত আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিহীন চাহিদার 'বুদবুদ'। কিন্তু 'বুদবুদ' তার অন্তর্নিহিত ধর্মের জন্যই হয় ক্ষণস্থায়ী, থেমে যায় তখনই যখন ঋণ শোধের পালা আসে। চাহিদা নিম্নগামী হয়। মুখ থুবড়ে পড়ে শিল্প, পরিবেশসহ গোটা অর্থনীতি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই উত্থান-পতনের চক্র তার জন্মলগ্ন থেকেই অনিবার্য। পুঁজিবাদের রোল-মডেল মার্কিন অর্থনীতিও পার পায় নি, আমাদের দেশের অর্থনীতিও বন্ধ্যাদশায় প্রবেশ করেছে। শিল্প-বৃদ্ধির সূচক শূন্য থেকে নেতির দিকে ধাবমান। সঙ্কুচিত হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রও। ফলে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরে। 'ছাপান্ন ইঞ্চি' ছাতির শক্তিমান পুরুষের মিথও ভাঙতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় 'যোগ-ক্রিয়ার' প্যাশন যদি মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরে তৈরি করা যায়, সাথে হালকা করে একটু মেডিটেশন, একটু আধ্যাত্মিক চর্চা—তাহলে মধ্যবিত্তের ধূমায়িত ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত করা যাবে। আর যতটুকু নির্গত হবে, তাও হবে 'সফট কমিউনালিজমের' চোরা পথে! দুর্বল হবে সাধারণ মানুষের আন্দোলন-সংগ্রাম। কারণ মধ্যবিত্তের ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব হল শ্রমজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ততা ভিত্তিক লড়াইয়ে সাধ্যমত রাজনৈতিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটানো। 'যোগ-ক্রিয়ায়' বুঁদ হয়ে থাকা মধ্যবিত্ত যদি এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, আখেরে লাভ বর্তমান ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের।

তাই 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর মতোই 'যোগ দিবস'-এর ধামাকাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সুপরিকল্পিত। যে দেশে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে প্রতিদিন প্রসূতি মা ও শিশুর মৃত্যু হয়, যে দেশে প্রাথমিক চিকিৎসার পরিকাঠামোর অভাবে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কলেরার মতো 'তামাদি' হয়ে যাওয়া রোগেও মানুষ অহরহ মারা যায়, সেখানে সরকারী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত কোন কোন ক্ষেত্রগুলির—এই প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। 'যোগ' নিয়ে হুল্লোড়ের পিছনে যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাকে বিয়োগাত্মক পরিণতির দিকে টেনে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। নচেৎ বিপদ অনিবার্য।

পুনশ্চঃ রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেসের নয়া নামকরণ হল 'যোগ-ক্রিয়া এক্সপ্রেস'! পাঠক বন্ধু সিঁদুরে মেঘ দেখতে পাচ্ছেন? □

২ জুলাই, ২০১৫

শোক সংবাদ ঃ তথ্যাঘাতে ইতিহাসের অপমৃত্যু

'ইতিহাস' কি? এমনতর প্রশ্নের নিশ্চিতরূপেই দ্বি-বিধ উত্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রথাগত শিক্ষার গণ্ডীতে আবদ্ধ কোনো বিদ্যার্থীর নিকট এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর হইবে, 'ইতিহাস' একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়, যাহাতে সুদূর অতীত হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংগঠিত বিবিধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী কালপঞ্জী অনুযায়ী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অপরপক্ষে, যাঁহারা প্রথাগত শিক্ষার নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের কাছে 'ইতিহাস' শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় নহে, বিবর্তনধর্মী সমগ্র বিষয়ের ধারাবিবরণী। অর্থাৎ বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ব্যাপকার্থে ইতিহাসের অন্তর্গত। অবশ্য যে অর্থেই বিবেচনা করা হউক না কেন, ইতিহাসের অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে ইতিহাস।

এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সমাজ জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে যদি ইতিহাসের সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে জনমানসে দুশ্চিন্তার কৃষ্ণবর্ণ জলধি পুঞ্জীভূত হইতে বাধ্য। সম্প্রতি এমনই কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহা দেখিয়া, পড়িয়া ও শুনিয়া ইতিহাসের ন্যূনতম জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্যার্থীও কার্যত ভিরমি খাইতেছেন।

দিল্লী নিবাসী অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 'মিডিয়া-আইডল' এক ব্যক্তি সম্প্রতি ইতিহাসের স্বকল্পিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় ইতিহাস ও পুরাণের খিচুড়ি পাকাইয়া পরিবেশন করিয়াছেন। বলিয়াছেন, পুরাণে বর্ণিত মানব শরীরে হস্তী-মস্তক (গণেশ) প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি করিবার দক্ষতা সম্পন্ন চিকিৎসকের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ইহাই শুধু নয়, তিনি আরও বলিয়াছেন কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত হইতে প্রমাণিত হয়, সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে 'টেস্ট টিউব শিশু' সংক্রান্ত গবেষণা সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হইয়াছিল। তাঁহার পারিষদগণ বলিয়াছেন, বিমান আবিষ্কারের কৃতিত্ব রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের নয়, সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের আকাশে নাকি বিশালাকৃতি বিমান উড়িত প্রভৃতি।

দিল্লীস্থ মহাশয় যখন ইতিহাসের পিণ্ড চটকাইতে বদ্ধ পরিকর, তখন এই বঙ্গে আরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও তাঁহার ইতিহাস সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞানভাণ্ডার জনসমক্ষে উন্মোচিত করিয়া চলিয়াছেন। পূর্ববর্তী কিয়ৎকালের কয়েকটি নিদর্শন আমাদের স্মরণে রহিয়াছে। যেমন হুল দিবসে সিদো, কানহু-র সহিত 'ডহর বাবু'র পরিজনবর্গকে মঞ্চে আবাহন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে কলিকাতার বুকে সংগঠিত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য গান্ধীজী অনশন করিলে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত ফলের রস খাওয়াইয়া অনশন ভঙ্গ করা, রবীন্দ্রনাথ-শেলি-শেক্সপিয়রকে একই সময়ের কবি বলিয়া ঘোষণা করা ইত্যাদি। সম্প্রতি এমনই একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাহা হইল সতীদাহ প্রথা নিবারণ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গীয় বিধানসভায়। এই বিস্ফোরক তথ্য জানিতে পারিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া, উক্ত তথ্য নির্ভর একটি দৃশ্য কল্পনা করিতে পারি। বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন বসিয়াছে। ট্রেজারি বেঞ্চে বসিয়া রহিয়াছেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক। রাজা রামমোহন রায় জলদ গম্ভীর কণ্ঠে (মহাপুরুষ যখন জলদ গম্ভীর কণ্ঠই হইবে নিশ্চয়) সতীদাহ প্রথার কুফল সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেছেন। কিয়ৎদূরে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃদু মৃদু মস্তক সঞ্চালিত করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম বাহির করিয়া সম্মুখে রক্ষিত কাগজের উপর লিখিতেছেন—'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী...'। ডিরোজিও সাহেব প্রেসিডেন্সি (হিন্দু) কলেজে ক্লাস লইতে ব্যস্ত থাকিবার কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু মোবাইল ফোনে খবর লইতেছেন বিলটি পাশ হইল কিনা। পাঠক বন্ধু কুর্সি হইতে দয়া করিয়া ভূ-পাতিত হইবেন না। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন যদি বিধানসভায় পাশ হইতে পারে, তাহা হইলে উপরোক্ত দৃশ্য কল্পনা করিলে উন্মাদ রূপে নিন্দিত হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।

দিল্লীস্থ মহোদয় ও বঙ্গস্থ মহোদয়ার চারিত্রিক ও কার্যাবলীর বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতিহাসের পিণ্ড চটকাইতেও তাঁহারা উভয়েই সিদ্ধহস্ত। □

১৬ আষাঢ়, ১৪২২

শোক সংবাদ

কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গত ১৬ মে ২০১৫ রাত ৯.৪০ মিনিটে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। তিনি রেখে গেছেন চার পুত্র, দুই কন্যা, নাতি নাতনীদের। প্রায় দুই দশক আগে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছিলেন।

কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ১৯৩৩ সালের ২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নিশিকান্ত, মাতা বিরাজমোহিনী।

১৯৬৫ সালের ২০ জুন রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসুরেন্স, কলকাতায় কমরেড চৌধুরী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে এই অফিস থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কাণ্ডারী কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপী সাধারণ সম্পাদক, চার বৎসর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৬৯ সালে কলকাতা আর এ অফিসে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে সংগঠন পুনর্গঠিত হয় এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ১৯৯০-এ হুগলীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে তাঁকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৯৪ সালে বীরভূমের রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কমরেড চৌধুরী সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র Employees Fourm-এর প্রকাশনার কাজে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন।

কর্মচারীরা মর্যাদা অধিকার রক্ষার পাশাপাশি জনস্বার্থবাহী কাজ ও বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কমরেড চৌধুরী ছিলেন বামপন্থী মতাদর্শে আত্মনিবেদিত। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির পথ সমাজতন্ত্রের পক্ষেই তাঁর মতামত সোচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন বক্তৃতায় ও লেখায়।

গত ১৩ জুন ২০১৫ বেলা ২টায় রেজিষ্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্সের কলকাতার কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রয়াত কমরেড নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিমল চক্রবর্তী ও বন্যা মুখার্জিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা। পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদীপ চৌধুরী। সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি বিমল চক্রবর্তী। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন অশোক দাস, পুত্র প্রদীপ চৌধুরী এবং প্রাক্তন নেতৃত্ব সীমা মুখার্জি ও অরুণ চ্যাটার্জি। □

কমরেড অরুণ চৌধুরী

বীরভূম জেলার বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশে অগ্রনী যোদ্ধা ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অরুণ চৌধুরী গত ১৮ জুন সিউড়ির বাসভবনে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

বীরভূম জেলার আদিবাসী সমাজের কাছে যিনি ছিলেন 'মারাং মাস্টার'। যাদের প্রাপ্ত অধিকার অর্জনের জন্য সারা জীবন তাদের পাশে থেকে লড়াই করেছেন।

জন্ম ১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ কলকাতায়। তরুণ বয়সেই দীক্ষিত হন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে। শিক্ষা শ্রীরামপুর কলেজে। পরে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩ বীরভূমে স্থায়ীভাবে চলে আসেন ও নগরী সুধাংশুবদনী শিক্ষা নিকেতনে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

ভূমিহীন কৃষক, বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ ও অন্যান্য অন্ত্যজ অংশের জীবন সংগ্রামে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন এবং তাদের সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

১৯৮৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর রচিত, সম্পাদিত বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত—সাঁওতাল অভ্যুত্থান, গোমানীর গর্জন, উৎপলখণ্ড, চৈত্রদিন, জীবনের সংগ্রামে কমরেড আবদুল হালিম ইত্যাদি। তাঁর 'আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম' বইটি ২০১৩ সালে মুজফ্ফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। □

জরুরি অবস্থার চল্লিশ বছর—ফিরে দেখা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বছরটি অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারির চল্লিশতম বর্ষ। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাত্রে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ঘোষণায় বলেন যে, "In exercise of the powers conferred by clause I of Articile 352, President of India, by this proclamation declare that a grave Emergency exists whereby the security of India is threatend by internal disturbances." অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে জাতীয় নিরাপত্তা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার দরুণ জরুরি অবস্থা জারি করা হল। এটিই হল মোদ্দা কথা। কিন্তু সেই সময় কি এমন ঘটেছিল, যে জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে? জরুরি অবস্থা ১৯৭৭ সালের জানুয়ারির মাসে প্রত্যাহৃত হয়। ঐ বছর অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় অ-কংগ্রেসী সরকার। অবসান ঘটে কংগ্রেস দলের একচ্ছত্র আধিপত্যর। কিন্তু কেন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল? জরুরি অবস্থায় ১৯ মাস জাতীয় জনগণকে কী অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছিল? বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থার প্রসঙ্গটি কেন স্মরণ করা প্রয়োজন? এইসব প্রসঙ্গের আলোচনা বিশেষ জরুরি।

এক

জরুরি অবস্থা জারির আপাত এবং আশু কারণ কিছু ছিল ঠিকই, কিন্তু তা মূল বা প্রধান কারণ নয়। জরুরি অবস্থা জারির পিছনে মূল কারণ ছিল দেশের অভ্যন্তরে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এক কথায় বলা চলে যে বুর্জোয়া জমিদার ব্যবস্থার গভীরতর সঙ্কটের পরিণতিতেই জারি হয়েছিল সারা দেশে জরুরি অবস্থা।

অবশ্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বা একাংশের সাংবাদিককুল এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ ছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে এর অন্যতম কারণ বলে এঁদের একাংশ মনে করেন। আবার কেউ কেউ ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে তাকেই জরুরী অবস্থা জারির পিছনে অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেন। অপর এক অংশের মতে ইন্দিরা গান্ধী সব সময়ই চাটুকার পরিবৃতা হয়ে থাকতে পছন্দ করতেন। এই চাটুকারেরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার স্বার্থে স্বভাব-অনিশ্চিত ইন্দিরা গান্ধীকে জরুরি অবস্থা জারি করতে প্ররোচিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের এক পত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এই পত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এছাড়া এইসব প্রসঙ্গ কুলদীপ নায়ারের 'দ্য জাজমেন্ট', উমা বাসুদেবের 'টু ফেসেস অব ইন্দিরা গান্ধী', ডি আর মানেককরের 'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব ইন্দিরা গান্ধী' বা জনার্দন ঠাকুরের 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু ঘটনা ছিল—যা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। বস্তুতপক্ষে ১৯৭৪ সাল থেকেই দেশব্যাপী দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে গুজরাটে তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নব-নির্মাণ আন্দোলন ব্যাপক চেহারা নেয়। 'চিমন চোর'-এর অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভে সরকারী বাসসহ বিভিন্ন সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এর পরিণতিতে মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে চিমনভাই পদত্যাগ করেন। ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে বিহারের কংগ্রেস সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সমিতি বিভিন্ন সভায় জয়প্রকাশ নারায়ণকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দেশব্যাপী সংগঠিত হয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট। ১৯৭৪ সালের ৮ মে থেকে শুরু হয় বিশ লক্ষ রেল শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট। ২০ দিন ধরে এই ধর্মঘট চলে। এই ধর্মঘটকে ভাঙবার জন্য ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়। কাঁচরাপাড়া, আদ্রা, খড়্গপুর প্রভৃতি স্থানে রেল কলোনীগুলিতে জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রেল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করে।

১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা এক রায়ে নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের কারণে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে দেন এবং ছয় বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। জুন মাসে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাস্ত হয়। ২৫ জুন রামলীলা ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবি করেন। ঐদিন রাতেই জরুরি অবস্থা জারি হয়।

১৯৭১ সালে 'গরিবী হঠাও', 'বেকারী হঠাও' শ্লোগান দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হলেও, তিন বছরের মধ্যেই তাঁর দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি ভাঁওতায় পরিণত হয়। অন্যদিকে এর সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায় মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি। জরুরি অবস্থা জারির পূর্বে এসবের বিরুদ্ধে সারা দেশেই ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

দুই

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সাথে সাথেই নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি আক্রান্ত হতে শুরু করে। জরুরি অবস্থাকালীন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী-মধ্যপন্থী সব দলের নেতা-কর্মী এমনকি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধীদের পর্যন্ত ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি সাংবাদিক, সমাজকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা পর্যন্ত বাদ যাননি। ইতোপূর্বে জারি হওয়া মিসা আইনকে আরও কঠোরভাবে সংশোধন করা হয়। সংবিধানের ১৪, ১৯, ২১ ও ২২ নম্বর ধারায় অর্পিত সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। প্রাক্ সেন্সরশিপ জারি করে স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই রাজ্যে সেন্সরশিপের কঠোরতা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি পর্যন্ত প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। আকাশবাণী সহ বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গান গাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জরুরি অবস্থা জারির পরদিনই অর্থাৎ ২৬ জুন জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "অল্প কিছু সংখ্যক লোকের কাজকর্মে বিশাল গরিষ্ঠ অংশের অধিকার(!) আজ বিপন্ন। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাতে জাতীয় সরকার দেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার শক্তি হারায়, তাহলে দেশের বাইরে থেকে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সেসব কথা বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।"

ইন্দিরা গান্ধীর এই ভাষণ ছিল সত্যের অপলাপ মাত্র। মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং ওয়াশিংটন ও লন্ডনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এম সি চাগলা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, "একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই, প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি বলি, এরকম কোনো ষড়যন্ত্রের পক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণাদি উপস্থিত করা হয়নি—ষড়যন্ত্র ছিল এবং তা হল প্রধানমন্ত্রীর নিজেরই।" বিশিষ্ট বামপন্থী সাংসদ এ কে গোপালন ২১ জুলাই ৭৫ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক বক্তৃতায় বলেন, "জরুরি অবস্থ জারির আকস্মিক ঘোষণা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিপদের জন্য নয়, সেটা ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ও গুজরাটের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণে।... কে বিশ্বাস করবে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে যে জনপ্রিয় শক্তি লড়াই করছে তাদের অবদমিত করে, তাদের আন্দোলনকে দমন করে এবং তাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।"

জরুরী অবস্থা সম্পর্কে এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য হাজির করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দর্শনের অধ্যাপক ডেভিড মেলবোর্ন। লন্ডনস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন তাঁকে ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য ফেলোশিপ দিয়ে ভারতে পাঠায়। তাদের আশা ছিল মেলবোর্ন জরুরি অবস্থার সমর্থনে প্রচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি ১৯৭৬ সালের ২০ মার্চ বার্মিংহাম টাউন হলে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের সভায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা আমরা কীভাবে বর্ণনা করব? কীভাবে বর্ণনা করবো সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকারের সমাধি, বাক্ স্বাধীনতা, সংগঠন গড়া, সভা করার অধিকারের ধ্বংস সাধনের ঘটনাকে? ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতার বিলুপ্তি, কঠোর সেন্সরশিপ আর ব্যাপক হারে জনসাধারণকে গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলিকেই বা কীভাবে বর্ণনা করবো। যে কুড়িটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি গিয়েছি এবং বক্তৃতা করেছি তার প্রত্যেকটিতেই ছাত্র অধ্যাপকদের কারাবাসের বর্ণনাই বা কী করে করবো? সরকারী কর্মচারীদের পাইকারি হারে বরখাস্ত করা, বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ করানো এবং ব্যাপক শ্রমিক কর্মচারীদের বাড়তি ঘোষণা করানোর ঘটনাগুলিকেই বা তুলে ধরব কীভাবে?" মেলবোর্ন তাঁর এই বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এইভাবে, "যখন ভারতবর্ষে ছিলাম আমি শুনেছি, শাসকশ্রেণীর পদলেহনের সর্পিল শব্দের পিছনেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মানুষের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। পা-চাটাদের আওয়াজ ছাপিয়ে কোটি মানুষের ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।"

সারা দেশের সাথে এই রাজ্যেও জরুরী অবস্থার হিংস্র আক্রমণে শ্রমিক কর্মচারীরা আক্রান্ত-রক্তাক্ত হয়েছেন। অবশ্য এই রাজ্যে ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকেই আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল। জরুরি অবস্থ জারির পর নেমে আসা আক্রমণ ছিল তারই সম্প্রসারণ মাত্র। জরুরি অবস্থার সময় ১৫ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতাকে মিসায় গ্রেপ্তার করে জেলের অভ্যন্তরেই সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের মোট ৫৮ জন কর্মচারী হয় বরখাস্ত হয়েছেন অথবা চাকরির মেয়াদ শেষের পূর্বেই অবসরগ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

৪০ বছর পূর্বে জারি হওয়া ১৯ মাসের জরুরি অবস্থা ছিল এক দুঃশাসনের কালপর্ব। এই পর্বে শুধু যে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারই আক্রান্ত হয়েছিল তা নয়, জীবন-জীবিকাও আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৬ সালের ২৫ অক্টোবর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যের শ্রম সচিবদের বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে জানানো হয় ১৯৭৫-এর জুন থেকে ১৯৭৬-এর জুলাই মাসের মধ্যে দেশের কলকারখানায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার শ্রমিক লে-অফ হয়েছিল। ঐ সময় ক্লোজারের শিকার হয়েছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার জন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় জানা যায় যে জরুরি অবস্থার সময় ৩০০টি বড় ও মাঝারি কারখানা এবং ৪০ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছিল। ফলে কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে এই ১৯ মাসের দুঃশাসনের কালপর্বে গোটা দেশটাকেই এক কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল।

তিন

জরুরি অবস্থার অবসান ১৯৭৭ সালে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ঘটে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের কোনো আশঙ্কাই নেই। এই প্রশ্নে ডেভিড মেলবোর্ন তাঁর পুস্তক "অ্যান আই টু ইন্ডিয়া" (১৯৭৭) গ্রন্থে লিখেছেন, "স্বাধীনতা উত্তর ভারতের ইতিহাসে জরুরি অবস্থা হলো এক বিরামহীন ব্যাপার। এই ইতিহাসকে জরুরি অবস্থা পূর্ব গণতন্ত্র, জরুরী অবস্থাকালীন একনায়কতন্ত্র এবং জরুরি অবস্থা পরবর্তী গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এরকম তিন ভাগে ভাগ করা যায় না।"

বর্তমান জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতিতে ডেভিড মেলবোর্নের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিজেপির ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থার দিকে মোড় নেওয়ার প্রক্রিয়া সংহত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নব্য উদারবাদী আক্রমণ এবং হিন্দুত্ববাদের বিপদ যুক্ত হয়ে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। একই সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বৈরতন্ত্রের বিপদও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক বছরে এই তিন ধরনের আক্রমণই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নির্বিচারের বিলগ্নীকরণ-বেসরকারীকরণ, গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সামরিক সহযোগীদের সাথে স্ট্র্যাটেজিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, সামাজিক কল্যাণখাতে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাই, জনগণের উপর আর্থিক বোঝা চাপানো এবং দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য ব্যাপক কর ছাড় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

একইসাথে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আর এস এস ও তার শাখা সংগঠনগুলির সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড। ভোট ব্যাঙ্ক তোষণে গো-মাংস নিষিদ্ধ, লাভ জিহাদ, ঘরওয়াপসি প্রভৃতি বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচার তৈরি করছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। এর পাশাপাশি নয়া শিক্ষানীতিতে সাম্প্রদায়িক উপাদান যুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে বেছে বেছে নিজেদের লোক বসানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এই রাজ্যে বিগত চার বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও দল জনগণ বিশেষত শ্রমিক কর্মচারীদের উপর ফ্যাসিস্ট কায়দায় আক্রমণ চালাচ্ছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভই আজ আক্রান্ত।

পূর্বোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির পটভূমিতে জীবন-জীবিকা এবং গণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্র অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে আরো বেগবান করতে হবে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় ধর্মঘট ও এ রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারী-শ্রমিকদের ধর্মঘটকে তাই সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত করতে হবে। □

বিদ্রোহী মননে সমুজ্জ্বল অগ্নিবীণার কবি কাজী নজরুল

পরমেশ দে

রবীন্দ্র প্রভাবিত কাব্য চর্চার পরিমণ্ডলে যে ক'জন কাব্য জগতে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কেবলমাত্র কাব্য চর্চার ক্ষেত্রেই বা বলি কি করে, তাঁর গোটা জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক, রাজনৈতিক সংগ্রাম তাঁকে এক অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত করেছে।

কবি জীবনানন্দ দাশ আর কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন একই বছরে ১৮৯৯ সালে। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত জন্মছিলেন তার প্রায় এক দশক আগে ১৮৮৮-তে। একই সময় পর্বে জন্মালেও এঁদের কাব্য চর্চার, জীবন চর্যার মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। নজরুলের নানা কবিতায়, লেখায় তা পরিস্ফুট। কবি জীবনানন্দের মতো রোমান্টিসিজমের প্রতিফলন নজরুলের কবিতায় ছিল না বললেই চলে। আবার যতীন্দ্রনাথের মতো পল্লী সমাজের ছবিও তেমন একটা ধরা দেয়নি নজরুলের কবিতায়। যদিও তাঁর 'ঝিঙে ফুল'-র (১৯২৬) কবিতা গুচ্ছে সেই বিখ্যাত 'লিচু চোর' কিংবা 'খাঁদু দাদু', 'প্রভাতী', 'খুকু ও কাঠবেড়ালি'-তে গ্রাম্য ছোঁয়ার সাথে সরল শিশুমনের অনাবরণ প্রকাশ ভঙ্গিটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতার প্রধান ভাবধারা থেকে এটা ছিল ব্যতিক্রমী। যেমন ব্যতিক্রমী কিছু প্রতিফলন দেখা গেছে পরবর্তীতে ঈশ্বর বা খোদা ভাবনার প্রতিচ্ছবি সমন্বিত কিছু কবিতায় বা রচিত গানে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নজরুল ছিলেন বিশ্ব মানবতার সন্তান। তার কোনো ধর্ম, জাত নেই। ১৯২৪ সালে কলকাতায় প্রমীলা সেনগুপ্ত (আশালতা সেনগুপ্ত)-র সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সময় কবি কখনও প্রমীলা দেবীর ধর্মান্তরকরণ করান নি—তাঁর সন্তান-সন্ততির নামকরণেও প্রতিফলিত হয়েছে একই চিন্তার প্রতিফলন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক প্রবল চেতনা সর্বদাই ঝড়ের মতো উত্তাল ছিল তাঁর কবিতায়। কখনো লিখছেন—''গাহি সাম্যের গান— / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান / যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রীশ্চান / গাহি সাম্যের গান।'' আবার যখন তিনি দেখেন, ধর্মীয়বোধের সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে বিভেদপন্থা সৃষ্টি করে শাসক-শোষক তার শোষণ কায়েম রেখে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকারকে শৃঙ্খলিত করে রাখে—সাম্রাজ্যবাদী শাসক পরাধীনতা প্রলম্বিত করার চেষ্টা করে—তখন বঞ্চিত মানুষকে হুঁশিয়ারী জানিয়ে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় আহ্বান জানান, ''হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?/ কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।''

কাজী নজরুল শৈশব থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা। সেই 'লেটোর' দলের গায়ক থেকে হাবিলদারের চাকরি পর্যন্ত। দারিদ্রের বিরুদ্ধে অসীম সংগ্রামের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছিল গরিবের বন্ধু, সর্বহারার নিকটতম প্রতিনিধি, অবহেলিত চিরশোষিতের একান্ত আপনার জন। অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষদের জন্য তাঁর হৃদয়বীণায় করুণ সুরের মূর্ছনা ধ্বনিত হত। 'সর্বহারা'র কবিতাগুচ্ছের ছত্রে ছত্রে তা বাঙ্ময় হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কবি লিখেছেন, 'বন্ধু গো, আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ জ্বালা এই বুকে / দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে, / রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা'।.... 'প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস / যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ'। আর নারী স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়ে বলেছেন, ''হাতে রুলি, পায়ে মল, / মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল! / যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ। / দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আবরণ।''

হিন্দু-মুসলমান বা নারী জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গ নয়, নজরুলের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল মানুষ। তাঁর ভাবনায় ছিল, পরাধীনতা সব মানুষকেই বঞ্চিত করে। আর বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িতের কোনো জাত নেই। ১৯২০ সালের মে মাসে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমেদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নবযুগ' সান্ধ্য দৈনিক, ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকা, ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা পরে ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট যা 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হয়—এই সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত

নজরুলের বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে, কবিতায়-গদ্যে তাঁর আপসহীন প্রতিবাদী চরিত্রের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

১৯৩৬-এর কবি সংর্ধনার উত্তরে নজরুল বলেছিলেন, ''বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান—সেনাদলের তুর্য্য বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়... আমি জানি এই পথ যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাদের নখরঃ-দংশনের আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু এই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।''

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শুরুতে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল, যুবরাজ-প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে হরতাল পালিত হয়, ছাত্র ধর্মঘট, বয়কটে প্রতিবাদে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। ব্রিটিশের জেলখানায় স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের বিশাল উন্মাদনা বর্ধমানের অখ্যাত গ্রাম চুরুলিয়াতে পৌঁছাতে বিলম্ব করেনি। একে চরম দারিদ্র তার ওপর লড়াইয়ের উন্মাদনা—এই দুইয়ের প্রভাবে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই 'দুখু মিঞা' ব্রিটিশের ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চলে গেলেন যুদ্ধে। সেটা ১৯১৭ সাল। রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বলশেভিক আন্দোলনের জয় এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের রাষ্ট্র—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, নজরুল যুদ্ধ শিবিরে থাকাকালীন এই খবর রাখতেন এবং লালফৌজের বিজয় অভিযানের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হতেন। তাঁর লেখা 'ব্যথার দান' গল্পে এর প্রকাশও রয়েছে। এই গল্পের দুটি চরিত্র দারা ও সয়ফুল আফগানিস্তানের এলাকা পার হয়ে ককেসাসে গিয়ে লালফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং বিপ্লবের পক্ষে লড়েছিল।

১৯২০-এর জানুয়ারিতে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রথমে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের মেসে, পরে মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসের একই ঘরে বাস। এই সময়েই নজরুলের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। মনে আন্দোলনের উচ্ছলতা, প্রাণে বিপ্লবী আবেগ-উচ্ছ্বাস একে একে প্রতিফলিত হয় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। এ কারণে কারাবরণও করতে হয়েছে তাঁকে। নজরুলের যুগান্ত সৃষ্টিকারী কবিতাগুলি এই সময় থেকেই পর পর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র প্রথম প্রকাশ কার্তিক, ১৩২৯ (ইং ১৯২২)—যার অন্তর্ভুক্ত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথমে 'বিজলী'-তে পরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিখ্যাতি লাভ করেন। বিদ্রোহী কবি হিসাবে কবি যে অভিধা লাভ করেন—তার মূলেও এই কবিতাটি। কবি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি করে এই কবিতাটি শোনানোর পর রবীন্দ্রনাথ কবিকে আলিঙ্গন করে বলেন, ''তোমার কবিতায় জগৎ আলোকিত হোক...''। কবিতাটি বাঙালি মননে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল।

পরবর্তী সময়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতাগুলির মধ্যে আমরা পেয়েছি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার', 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'মানুষ' ইত্যাদি এবং 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটির প্রেক্ষাপট এখানে উল্লেখ করছি কবির সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃঢ় অবস্থানের একটা টুকরো ছবি হিসাবে। ১৯২৬-এর এপ্রিল মাস কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেঁধেছিল প্রথম বার। তারপর আরো দু'বার। দাঙ্গার খবরে নজরুল ব্যথিত, আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তখন তিনি ব্যস্ত কৃষ্ণনগরে মজুর স্বরাজ পার্টির প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনে ও যুব সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। মুজফ্ফর আহমেদের উদ্যোগে সেই সময়ে বাংলায় ও উর্দুতে দাঙ্গাবিরোধী এক ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। নজরুল তাতে সই করেছিলেন। নজরুল দাঙ্গার বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে সম্মেলনের অন্যান্য দায়-দায়িত্বের মধ্যে থেকেও গণমুখী মনোবৃত্তি নিয়েই সম্মেলনের যুব প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর স্বাধীনতকামী দাঙ্গাবিরোধী অসাম্প্রদায়িক চিত্তের ভাবনা গানের মাধ্যমে। সেই গানই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'—যা কোরাসে গাওয়া হয়েছিল যুব সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। এই গানটিই পরে বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' শিরোনামে। যেখানে বঞ্চিত মানুষের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হয়ে বলেছেন, 'ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥' কিন্তু শাসকের পরিবর্তনেই যে যথার্থ স্বাধীনতা, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। বঞ্চিতের বঞ্চনার অবসান হয় না। নজরুল তা বিলক্ষণ জানতেন। 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ তাই দেখি নজরুল বলছেন, 'আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস। / কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙারিয়া কাড়িয়া গ্রাস; / এল কোটি টাকা এল না স্বরাজ! / টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ। / মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস! / হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।'

নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন ছোট গল্পধর্মী রচনা দিয়ে, পরে লেখেন কবিতা ও গান। প্রথম পুত্রের অকাল মৃত্যু (১৯৩০) তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতার সূচনা করে। কিন্তু তার সমস্ত জীবন ও কাব্য সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান। তাঁর মধ্যে যে প্রাণের প্রাচুর্য ছিল, তাই স্বতোৎসারিত হয়েছে তাঁর রচনার মধ্যে। সামাজিক পরিবর্তন ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের ঐক্য ও সহমর্মিতার প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান মর্মবস্তু এটাই, বিদ্রোহী মননে সর্বদাই তিনি 'অগ্নিবীণা'-র ঝঙ্কার তুলেছেন 'সর্বহারা' মানুষের অধিকারের সপক্ষে। এরকম একজন তেজস্বী মহামানবের শেষ জীবনটা কেটেছে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণাজর্জর পরিস্থিতিতে। ১৯৩৯ সালে কবি পত্নী প্রমীলা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ১৯৪২ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন কবি—তাঁর স্বাভাবিক বোধশক্তির অবলুপ্তি ঘটে। 'লুম্বিনী পার্ক' ও 'রাঁচী মেন্টাল হসপিটালে' চিকিৎসা করেও বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। ১৯৫৩ সালে প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে জার্মানিতেও চিকিৎসিত হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে কবি পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এখানেই ১৯৭৬ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। □

(প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ২৩ বছরের সাহিত্য জীবনে নজরুল লিখেছেন ২২টি কবিতা গ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ, ২টি কিশোর কাব্য, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি নাটক, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৬টি সংগীত গ্রন্থ)

রক্তদান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণহ্রদ অঞ্চলের উদ্যোগে সেচভবন লনে কর্মচারী সমাবেশের মধ্য দিয়ে গত ২৬ মে, ২০১৫, বেলা ১২টায় 'রক্তদান কর্মসূচী' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি শ্যামল সরকার।

রক্তদান করেছেন ৩ জন মহিলাসহ ৩৩ জন সদস্য বন্ধু। এর মধ্যে ১ জন চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত মহিলা কর্মচারী। □

বিগত রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী **পূর্ব মেদিনীপুর** জেলায় গত ২৩ জুন ২০১৫ কাঁথি ও এগরা মহকুমার কর্মচারীদের নিয়ে কাঁথি মহকুমা সমিতি ভবনে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। এই রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক পিনাকী অধিকারী। এই শিবিরে মোট ৪২জন রক্তদান করেন।

২৪ জুন ২০১৫ পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সদরের কর্মচারী ভবনে রক্তদান শিবিরসহ জেলার দুস্থ-মেধাবী ছাত্রী রীণা পাত্রকে এককালীন ৫০০০ টাকা অনুদান ও সংবর্ধনা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান হয়েছে। রক্তদান শিবিরসহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন গোপাল পাঠক, দপ্তর সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমর ভট্টাচার্য। তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার কর্মচারী বন্ধুগণ এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। মোট ৩১ জন রক্তদান করেন।

দুটি শিবিরে ১০ জন মহিলাসহ মোট ৭৩ জন রক্তদান করেন। এই দুটি অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বোলপুর মহকুমা শাখার উদ্যোগে ২১ জুন '১৫ কর্মচারীভবনে সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে একটি 'স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির' প্রতিপালিত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে মহকুমার কর্মচারীদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন।

এই উপলক্ষে কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অমৃত মণ্ডল ও বাদল জানা। রক্তদানের কর্মসূচী সম্পর্কে ও রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও সচেতনতার উপর বক্তব্য রাখেন ডাঃ তীর্থঙ্কর চন্দ্র। □

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের সত্তরতম বছরে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল, সঙ্গিনী ইভা ব্রাউনকে হত্যা করে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন জার্মানীর সর্বময় কর্তা এডলফ হিটলার। সোভিয়েত লাল ফৌজ তখন বার্লিন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে, অর্থাৎ বার্লিনের পতন তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরেই নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এই স্বৈরাচারী মহা-শাসক। কিন্তু ততদিনে মৃত্যু ঘটে গেছে অসংখ্য মানুষের, ধ্বংস হয়ে গেছে তখনকার বেশ কয়েক লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি সহ বেশ কিছু অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। অবশেষে সে মারণ যজ্ঞ থামলও। থামল মূলত লাল ফৌজের পরাক্রমের কাছে নতি স্বীকার করে। সে দিন তারা যদি বিজয়ী না হত, তাহলে অবধারিতভাবে মানুষের ইতিহাস লেখা হত অন্য ভাবে। বড়ো কলঙ্কময় হত, বড়ো যন্ত্রণার হত সে ইতিহাস। সে দিক দিয়ে বলা যায় যে, লাল ফৌজ সে দিন গোটা মানব সভ্যতাকেই রক্ষা করতে পেরেছিল, তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

এ বছর ৯ মে ৭০ বছর পূর্ণ হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের চূড়ান্ত বিজয়ের। ১৯৪৫ সালের ঠিক এই দিনেই নাজি বাহিনীর পক্ষে ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কিটেল সোভিয়েত ফৌজের প্রধান মার্শাল জর্জি জুখভের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে পরাজয় স্বীকার করেন। শেষ হয় ইউরোপের তথা বিশ্বের বৃহদংশ জুড়ে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে চলা নিধন যজ্ঞের। ঠিক তার আগের দিন, অর্থাৎ ৮ মে সোভিয়েত ফৌজ বার্লিনের রাইখস্ট্যাগের চূড়ায় লাল পতাকা উড়িয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিল বিজয়ের বার্তা— পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে যা আজও এক উদ্দীপনার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার পরের ইতিহাস সবার জানা। নাজি বাহিনীর পরাজয়ের পর মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অক্ষ শক্তির শেষ সম্বল জাপানও বাধ্য হয় আত্মসমর্পণ করতে, পরিসমাপ্তি ঘটে সভ্যতার ধ্বংসকামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। সোভিয়েত ফৌজের এই ঐতিহাসিক বিজয় দেশে দেশে মুক্তির আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে বাধ্য করেছিল পাততাড়ি গোটাতে। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ চলে এসেছিল সমাজতন্ত্রের ছাতার তলায়।

ইতিহাসবিদেরা মুক্ত কণ্ঠে সোভিয়েত ফৌজের এই অবদানের কথা স্বীকার করলেও, আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক ভাবে স্বৈরশাসন চালাতে চাওয়া শক্তিগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এ কথা শুধু অস্বীকারই নয়, মানুষের মন থেকে একেবারে মুছে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় নেমে পড়েছে। এটা ঠিক যে, ফ্যাসিস্ত জার্মানীর পতনের জন্য ইউরোপের জনগণসহ মিত্র শক্তির প্রায় সমস্ত সদস্য দেশগুলিরই কম বেশি অবদান রয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, লাল ফৌজের অবদানকে অস্বীকার করে ফেলতে হবে। অথচ এইসব দেশের নেতারা এমন সব ভাষ্য দিতে শুরু করেছেন, যার থেকে মনে হবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, মার্কিন শক্তিই আসলে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মূল কারিগর। আসলে পতনের পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূত তাড়া করে বেড়াচ্ছে এইসব দেশের নেতাদের। মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের গৌরবের ধারণাটুকুও থাকা মানে যে ধনতন্ত্রের পক্ষে বিপদ, সেটা তাঁরা হাড়ে হাড়ে বোঝেন বলেই এই পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতি।

দুঃখের হলেও সত্য যে, তাঁদের এই প্রয়াসে ইউরোপের মানুষ বেশ ভালো রকমেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। সমীক্ষা বলছে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানীর মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন যে লাল ফৌজই ইউরোপকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। অন্য দিকে ৪৩ শতাংশ মনে করেন যে এই কাজ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরে, ২০ শতাংশ মনে করেন ব্রিটিশরা এ কাজ করেছিল, আর ২২ শতাংশের জানাই নেই যে কাদের জন্যে তাঁরা আজ তাজা বাতাসে শ্বাস নিতে পারছেন। অর্থাৎ ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা শুধুমাত্র বিজেপির একচেটিয়া নয়, তাদের রাজনৈতিক গুরুরাও এই কাজে সমান পারদর্শী। এটা বারে বারেই প্রমাণিত যে মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে না থাকলে প্রকৃত 'জন-বিরোধী' হয়ে ওঠা যায় না।

সত্যকে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক বরং। জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। টানা ছয় বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ৬১টি দেশ আর তার সাথে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই দেশগুলোর ১৭০ কোটি মানুষ। অর্থাৎ তখনকার পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই জড়িয়ে পড়েছিলেন এই যুদ্ধে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, মানুষের উপর জোর করে এই যুদ্ধটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র দখলদারি আর তখনও শৈশবের মধ্যেই থাকা পৃথিবীর প্রথম এবং এক মাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই। যুদ্ধে যে সাত কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলেন, তার ৪০ শতাংশই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের। সদ্য জন্ম নেওয়া দেশটার ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ১,৭১০টা শহর, ৭০,০০০-এরও বেশি গ্রাম, ৩২,০০০ কারখানা আর ৬৫,০০০ কিলো মিটার রেল লাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল জার্মানরা। তখনকার মূল্যমানে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২,৬০,০০০ কোটি রুবল। পৃথিবীর কোনও দেশকেই এত বড়ো ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। সে সময় গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন একটাও পরিবার খুঁজে পাওয়া যায়নি, যার কোনও না কোনও সদস্য যুদ্ধে প্রাণ হারাননি। তা সত্ত্বেও দেশটা দমে যায়নি, বীরের মতো লড়াই করে পৃথিবীকে বর্বর স্বৈরশাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আজ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুক না কেন, ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে সেদিন তাদের কিন্তু গলায় অন্য সুর ছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলেছিলেন, ''লাল ফৌজ এবং রাশিয়ার জনগণ যেভাবে বীরের মতো লড়াই করে হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে তারা মার্কিন জনগণের হৃদয় জয় করে নিয়েছে''। তৎকালীন মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব আর স্টেট্টিনিয়াসের ভাষায়, ''সেদিন যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফল না হত, তাহলে এত দিনে জার্মানরা গ্রেট ব্রিটেন দখল করে নিত, আফ্রিকার একটা বড় অংশ চলে যেত তাদের কব্জায় আর লাতিন আমেরিকায় পা ফেলতে সমর্থ হয়ে যেত''। আর স্তালিনকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল লিখেছিলেন, ''একমাত্র রাশিয়ান সেনারাই পেরেছে জার্মান মেশিনগানের থেকে নলটাকে খুলে নিতে''! আসলে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মেই রাশিয়ার জমি থেকে জার্মানীর পশ্চাদপসরণের সময়েই তাদের চূড়ান্ত পরাজয় লেখা হয়ে গিয়েছিল। টানা তিন বছর ধরে রাশিয়ান সেনানীর মরণ পণ লড়াই জার্মানদের এতটাই দুর্বল করে দিয়েছিল যে এর পরে তাদের মাথা তোলার আর ক্ষমতাই ছিল না আর। এ কারণেই মুক্ত পোল্যান্ডের তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে মুক্ত কণ্ঠে বলা হয়েছিল, ''নাজি জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করার জন্য আমরা সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁদের এই চমকপ্রদ জয় গোটা বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্বর ফ্যাসিস্ত শক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে''।

এগুলো সামান্য কিছু উদাহরণ মাত্র। সেই সময়ে দিকে দিকে মানুষ সোভিয়েত জনগণের জয়গানে মুখরিত ছিলেন। তাদের প্রতি ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কি মনোভাব, সে কথা অজানা ছিল না সোভিয়েতের। তা সত্ত্বেও কি সোভিয়েত ইউনিয়ন, কি সেখানকার কমিউনিস্টরা— কেউই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সদস্য দেশগুলির অবদানকে কখনোও খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেননি। তাঁদের মতাদর্শই তাঁদের সে কাজ করতে দেয়নি। তাছাড়া এ কাজ করার কোনও দরকারও তাঁদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজও ইউরোপ সহ বহু দেশের মানুষই তাঁদের সেদিনের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও সে সময়ে সোভিয়েত বাহিনী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপের ১১টা দেশের প্রায় সাড়ে এগারো কোটি মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল শুধু নয়, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকেও প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধে ওই সাংঘাতিক পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও এ কাজ থেকে তাঁরা বিরত থাকেননি, থাকতে পারেননি তাঁদের কমিউনিস্ট মতাদর্শের কারণেই।

আর ধনবাদী দুনিয়ার মতাদর্শ? সেটা বোঝা যায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ে ক্ষমতাসীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের মনোভাব থেকে। এক জায়গায় তিনি বলছেন, ''জার্মানী জিততে থাকলে রাশিয়াকে সাহায্য করা আর রাশিয়া জিততে থাকলে জার্মানীকেই সাহায্য করা বুদ্ধিমানের কাজ হত আমাদের। আর এই ভাবেই শেষ হয়ে যেত এই দুটো শক্তিই''! ভাবুন কি জঘন্য মনোভাব। এমন নয় যে এটা ট্রুম্যানের কোনও ব্যক্তিগত অভিমত। এই মানসিকতা গোটা ধনবাদী দুনিয়া বহন করে আসছে সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই। নাহলে সেই ১৯৩৯ সালেই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া যেত, যদি আমেরিকা আর ব্রিটেন একটু উদ্যোগী ভূমিকা নিত। তারা সেই সময়ে অযথা সময় নষ্ট করা কিম্বা যুদ্ধে অযোগ্য এবং অদক্ষ সেনানায়কদের পাঠাতে থাকার কৌশল নিয়ে চলেছিল, যাতে এই যুদ্ধটা কিছুতেই থেমে যেতে না পারে। এর জন্যে যদি কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয় তো হোক! এর জন্যে যদি অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংসও হয়ে যায় তো পরোয়া নেই— তাদের শোষণের ব্যবস্থা কায়েম থাকলেই হল, তাদের সামনে সমাজতন্ত্র নামক বাধাটা দূর হয়ে গেলেই হল!

এই মনোভাব আছে এখনও এবং দুঃখের হলেও এটা সত্য যে সেই সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কবল থেকে সোভিয়েত সেনার হাত ধরে মুক্তি পাওয়া কিছু দেশও এখন এই চিন্তাধারার শরিক হয়ে গেছে। এই কারণেই বিজয়ের ৭০ বছর পূর্তিতে মস্কো থেকে বার্লিন পর্যন্ত পদযাত্রার অনুমতি দিচ্ছে না পূর্ব ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্র। বিপদের দিক এখন এটাই। সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের কারণে গোটা পৃথিবীতেই এখন দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির দাপাদাপি বাড়ছে। বাড়ছে শোষণের মাত্রাও। গত দশ বছরে ব্রিটেনের ধনিক শ্রেণী তাদের সম্পদের মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ফেলেছে। আমেরিকাতেও সেই একই চিত্র। সেখানে তথাকথিত আর্থিক বিপর্যয়ের পর মাত্র ১ শতাংশের হাতে চলে এসেছে দেশের ৯১ শতাংশ সম্পদ। আর এটা ঘটেছে গত মাত্র এক বছরে। মধ্যবিত্ত তথা গরিবদের আয়ের পরিমাণ কমছে হু হু করে। সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে 'মুনাফা' এখন পরিণত হচ্ছে 'অতি মুনাফা'য়। আর এই ধারা বজায় রাখার জন্যই সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরেও তাদের আপ্রাণ চেষ্টা তার চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার, তার যাবতীয় কৃতিত্বকে অস্বীকার করার। আর এই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা শুধু দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকেই মদত দিয়ে চলেছে তাই নয়, দুনিয়া জুড়ে গজিয়ে ওঠা নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকেও উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে। ইউক্রেনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এখন এদের স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরা আর এদের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও প্রসারিত করে তোলাই হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন। সেটাই হোক আমাদের আগামী লক্ষ্য। ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদ মুক্ত দুনিয়ায় শ্বাস নিক আমাদের আগামী প্রজন্ম। কোনও যুদ্ধের কোনও পদধ্বনি যেন শোনা না যায় সেই দুনিয়ায়। □

উৎসর্গ মিত্র

জেল প্রেস কর্মচারীদের সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ প্রেস অ্যান্ড ফর্মস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ২৮তম সম্মেলনগত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখে আলিপুর ফর্মস দপ্তরে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি অরুণ কর্মকার রক্তপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে প্রতিনিধি এবং অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহসম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাবে ও প্রস্তাবাবলী পেশ করেন যথাক্রমে অভিজিৎ পাল, স্বপন দাস এবং অজয় ঘোষ।

প্রতিনিধিদের আলোচনার পর সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জবাবী বক্তব্য পেশ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিবেদন, আয়ব্যয়ের হিসাব এবং দাবি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের মঞ্চে সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও বিদায়ী সভাপতি যথাক্রমে সন্দীপ বিশ্বাস এবং অরুণ কর্মকারকে পুষ্পস্তবক এবং পুস্তক স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী কার্যকালের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হন সভাপতি পদে অমিত ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক পদে সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ পদে অভিজিৎ পাল নির্বাচিত হন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন অরুণ কর্মকার, সুশান্ত সরকার এবং সুপ্রিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

রাজ্য জুড়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ সভা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানালেও সংগঠনের মজবুত ইমারতের একটি ইটও খসানো যায়নি। উপরন্তু সমস্ত চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে তার অনুগামী কর্মচারী সমাজকে নিয়ে বারে বারে রাস্তায় নেমেছে সংগঠন। কর্মচারীরাও বেশি বেশি করে শামিল হয়েছেন সংগ্রামের ময়দানে। সাম্প্রতিককালে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪-র ঐতিহাসিক জমায়েত, যৌথ কনভেনশন, ডিসেম্বর '১৪-তে ৫ দিন ধরে প্রবল ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে ধর্মতলায় দিবারাত্র অবস্থান, মহামিছিল এবং ৫ থেকে ৮ মে অ্যাপ্রন পরিধানের অভিনব ও সাহসী কর্মসূচী—সব ধরনের কর্মসূচীতেই শামিল হয়েছেন কর্মচারীরা। কিন্তু সরকারকে তার অবস্থান থেকে নড়ানো যায়নি। এই ধরনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছে সংগঠন তা ধারণ করে আরও বড় ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে নামতেই হবে সংগঠনকে। যে ধরনের আন্দোলনে আমরা এই সরকারকে ঘুম থেকে জাগাতে পারি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এটাই সময়ের চাহিদা। এই চাহিদাই বাস্তব হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে গত ৯ জুন।

বর্ধমান

বর্ধমান জেলায় ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে গত ৯ জুন, ২০১৫ বেলা ২টোর সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবেশে প্রায় ১৫০০ জন কর্মচারী, পেনশনার ও ফ্যামিলি পেনশনার উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমান অরবিন্দ স্টেডিয়ামের সামনে থেকে কর্মচারীদের একটি মিছিল জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে দিয়ে সমাবেশ স্থলে (টাউনহল ময়দান, বর্ধমান) পৌঁছায়। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন প্রণব আইচ, রফিউদ্দিন আহমেদ ও নারায়ণ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক বিশ্বনাথ দে। পরবর্তীকালে জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রণজিৎ দত্ত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সমাবেশের মূল বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী সমাবেশে উপস্থিত কর্মচারীদের কাছে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য উপস্থিত করেন।

সমাবেশে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র জেলা থেকেই তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে কর্মচারী ও পেনশনার বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই একই বিষয় নিয়ে গত ৪ জুন, ২০১৫ বর্ধমান সদরের বাইরের চারটি মহকুমায় (আসানসোল, দুর্গাপুর, কালনা ও কাটোয়া) বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে প্রতিটি মহকুমায় জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত থেকেছেন। সবকটি মহকুমা মিলিয়ে ছয় শতাধিক কর্মচারী ও পেনশনার মহকুমার বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

নব মহাকরণ

গত ৯.৬.১৫-তে ছুটির পর নবমহাকরণ ক্যান্টিন হলে এই কর্মচারী জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের সভাপতি উল্লাস নাথ সভা পরিচালনা করেন। অঞ্চল সম্পাদক সুখদেব শীঠ প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় বক্তা দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক বিস্তারিত ভাবে ৬ দফা দাবির তাৎপর্য বিশেষভাবে তুলে ধরেন এবং পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য করণীয় দিকগুলি নির্দেশ করেন। প্রায় দু'শতাধিক কর্মচারী বন্ধুর উপস্থিতিতে সফলভাবে এই কর্মসূচী অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সমিতিগুলি ও সেক্টরগুলির সাথে বসা, টিফিনে প্রচার সভা, স্লোগান শাউটিং সহ নানা ধরনের প্রচারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

উত্তর ২৪ পরগনা

কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৯ জুন, ২০১৫ এই জেলায় ৬ দফা দাবিতে ছুটির পর কর্মচারীদের এক বিশাল জমায়েত ও বিক্ষোভসভা সংগঠিত হয়। সহস্রাধিক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এই সভায় কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এবারের এই জমায়েতের বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘ প্রায় ৩ (তিন) বছর পর প্রশাসনিক বাধা অতিক্রম করে সমিতির দপ্তরের সামনে প্রকাশ্য জমায়েত করা সম্ভব হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই জমায়েতকে কেন্দ্র করে কর্মী, নেতৃত্ব ও কর্মচারীদের মধ্যে ছিল এক জয়ের মানসিকতা।

জেলার সভাপতি ও দুই সহসভাপতিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য উত্থাপন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক পার্থ গোস্বামী এবং পরবর্তীকালে বক্তব্য উত্থাপন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক খগেন নাগ। উভয় বক্তাই ৬ দফা দাবির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে ও কর্মচারীদের বকেয়া দাবিদাওয়া আদায়ে আরও তীব্র সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন। □

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা জমায়েতকে কেন্দ্র করে অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির বেশিরভাগ সমিতির মধ্যে একটা সজীবতা লক্ষ্য করা গেছে। একটা বড় সাফল্য ছিল কেন্দ্রীয় সফরসূচীর কারণে। কারণ সব জায়গায় না হলেও বেশিরভাগ ব্লকগুলিকে নিয়ে সভা করা হয়েছিল। ফলে কর্মচারীদের মধ্যে অনেকটা সাহসী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। জেলার বাস্তবতা অনুযায়ী মে মাসের ২৮ তারিখ তিনটি মহকুমার সদরে কর্মচারী জমায়েত করা হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণও ভালো ছিল। যেমন—খড়্গপুরের ১১০ জন, ঘাটালে ১৩০ জন, ঝাড়গ্রামে ১৪৫ জন। মোট ৩৮৫ জনকে যুক্ত করা গেছে। আর জেলা জমায়েতেও মহকুমা / ব্লক ও শহরের কর্মচারীরা যুক্ত হয়েছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে রাস্তার উপরে এই কর্মসূচী করা হয়। যদিও সেই স্থানে সভা করার অনুমোদন থানা দেয়নি। কিন্তু সংগঠনের দৃঢ় মনোভাব দেখে মহকুমা শাসক এবং অ্যাডিশনাল এস পি অনেকটা নমনীয় হন। উদ্দীপনার সঙ্গে জেলা শাসকের দপ্তরের কিছুটা দূরে মূল রাস্তার উপর এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। ছয় দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক দেব কুমার ভুঞা। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গঙ্গাধর বর্মন। জেলা ১২ই জুলাই কুমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অশোক ঘোষ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মনিশঙ্কর গিরি।

প্রায় ৭৩০ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে মহিলা ছিলেন প্রায় ১০০ জন। তিনটি মহকুমা থেকেও ভালো সংখ্যক কর্মচারী এসেছেন। তিনটি মহকুমার প্রাথমিক রিপোর্ট ৪২৫ জন যুক্ত হয়েছেন। সদরের ব্লকগুলি থেকেও কর্মচারীরা এসেছেন। এছাড়া জেলা সদরের কর্মচারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে বারে বারে দপ্তরগুলিতে সভা করা হয়েছে। সুদূর নয়াগ্রাম থেকে ১৫ জনের মতো কর্মচারী এসেছেন। বেলপাহাড়ী ব্লকের মহিলারা একটা ছোট গাড়ি করে জমায়েতে এসেছেন।

দক্ষিণাঞ্চল

অনিবার্য কারণে গত ২ জুন '১৫ এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলে। ঐদিন অফিস ছুটির পর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির হলে (আলিপুর) কর্মচারী জমায়েত হয়। এই সভা পরিচালনা করেন অঞ্চলের সভাপতি সন্দীপ বিশ্বাস। প্রথমেই অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ সদস্য নবীকরণ ও পত্রপত্রিকার গ্রাহকীকরণের কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত সমিতি ও সেক্টরগুলির কাছে আহ্বান জানান এবং ছয় দফা দাবি সভায় পাঠ করে দেন। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকূলতা ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। সমগ্র দেশের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ আগামী ২ সেপ্টেম্বর '১৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতাসহ ছয় দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের কথা তিনি উল্লেখ করেন। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের অনমনীয় আচরণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রাম আন্দোলনের জন্য সমগ্র সংগঠনকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। এই সমাবেশে শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

দার্জিলিং

দার্জিলিং জেলার কর্মচারী জমায়েত ও সমাবেশ শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সমতলের ৪টি ব্লকসহ শিলিগুড়ি সদরের প্রায় ৪০০ (চার শত) কর্মচারীর উপস্থিতিতে দাবি সমূহের ব্যাখ্যাসহ প্রাথমিক বক্তব্য উপস্থিত করেন জেলা সম্পাদক উত্তম চতুর্বেদী এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক সমরেশ ভট্টাচার্য, ১২ই জুলাই কমিটির দার্জিলিং জেলা কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব সুরঞ্জন চৌধুরী।

সভাটি পরিচালনা করেন মলিনা হালদার, উডেন লামু ডুকপা এবং কার্ত্তিক মল্লিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

লবণহ্রদ অঞ্চল

লবণহ্রদ অঞ্চলের সেচভবন লনে বিশাল কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী পালিত হয়। বিকেল ৫.৩৫ মিনিটে লবণহ্রদ অঞ্চল সাংস্কৃতিক টীমের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জমায়েতের কর্মসূচী শুরু হয়। অঞ্চলের সভাপতি শ্যামল সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। অঞ্চল সম্পাদক পিনাকী সেনগুপ্ত সংগঠনের আগামী কর্মসূচী ঘোষণাসহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এরপর বক্তা কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আশিস ভট্টাচার্য বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যে ৬ দফা দাবির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়। জমায়েতে উপস্থিত প্রায় ২৫০ জন কর্মচারী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রামী মেজাজে জমায়েতকে সার্থক করে তুলেছেন। কেন এই জমায়েত ও আগামী দিনে করণীয় সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরেন আশিস ভট্টাচার্য।

লবণহ্রদ অঞ্চলের এই ব্যাপক কর্মচারী জমায়েত জমায়েত কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

নদীয়া

নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর পাত্রবাজার ট্রাফিক মোড়ে বিক্ষোভ জমায়েতের আয়োজন করা হয়। উক্ত জমায়েতে ৩৩১ জন সদস্য কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি প্রদীপ বিশ্বাস। প্রাথমিকভাবে জেলা সম্পাদক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা। ৬ দফা দাবি নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে সামনে রেখে কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া হরিণঘাটা ব্লকে ঐদিনই ৬ দফা দাবিতে কর্মসূচী পালিত হয়। সভায় ব্লক সম্পাদক জনা মূর্মূসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় ৯০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি স্থানে আলিপুরদুয়ার, মালবাজার ও জেলা সদরে ৬ দফা জরুরী দাবিতে অফিস ছুটির পর মহকুমা জমায়েতের কর্মসূচী পালিত হয়। স্ব স্ব মহকুমার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্লক, সেক্টর, ইউনিট থেকে ব্যাপক কর্মচারী এই জমায়েত কর্মসূচীতে শামিল হয়। সমাবেশগুলিতে মহিলা কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।

আলিপুরদুয়ার ঃ ছয় শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে মহকুমা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কর্মচারী ভবনের সামনে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পল্লব গুহ ও সুনির্মল প্রামাণিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। ৬ দফা দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহকুমার যুগ্ম সম্পাদক শিউলী ঘোষ। প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক প্রাণতোষ ধর।

মালবাজার ঃ কর্মচারী ভবন থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে পুনরায় কর্মচারী ভবনে মিলিত হয় এবং সেখানেই মূল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে দুই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সন্দীপ মৈত্র ও রেনা গাঙ্গুলীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। ৬ দফা দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহকুমা সম্পাদক সুমেশ চক্রবর্তী। প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম সহসম্পাদক বাণীব্রত সাহা।

জলপাইগুড়ি সদর ঃ জেলা কর্মচারী ভবন থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে মূল জমায়েত হয় কর্মচারী ভবনে। মিছিল ও সমাবেশে ছয় শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত চিলেন। কমল ভট্টাচার্য, অনিতা বর্মন ও লক্ষণ মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সমাবেশের কাজ পরিচালনা করেন। ৬ দফা দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক কৌস্তুভ রায়। প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সত্যজিৎ ঘোষ।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলাতে ৯ জুন ২০১৫ জেলা সদরে ও রঘুনাথপুর মহকুমায় ছয় দফা দাবিতে কর্মচারী জমায়েতের কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

জেলা সদরে ১৪টি ব্লক ও পাঁচটি অঞ্চল থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই জমায়েত হয়, তীব্র দাবদাহের মধ্যেও কর্মচারীদের এই জমায়েত এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জেলা জমায়েতের কর্মসূচীতে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন রঙ্গলাল মাহাত, হেম মুদিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করা, ৪৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন এবং ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে লাগু করা সহ ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য, পরবর্তীতে দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলার যুগ্মসম্পাদক, সুজয় সরকার এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন রায় চৌধুরী। জমায়েত স্থল ছিল কাছারী রোড, পুরুলিয়া (ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট কম্পাউন্ডের সামনে)। ৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে কর্মচারীদের এই জমায়েত ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির শতাধিক সদস্য ও সদস্যার উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষ্য করার মতো। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিরোধী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে বৃহত্তর লড়াই গড়ে তোলা এবং এই লড়াইতে সাহসের সঙ্গে শামিল হওয়ার আহ্বান জানায় এই জমায়েত।

অপরদিকে রঘুনাথপুর মহকুমায় এলআইসি অফিসের সামনে (বিডিও অফিসের সামনে) শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাটি পরিচালনা করেন মহকুমা কমিটির নেতৃত্ব বিপন সিংহ দেও ও পাঁচকড়ি মাঝিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক কে ভি এস শ্রীনিবাস রাও পরবর্তীতে দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার সহ সম্পাদক রামাশিস অধিকারী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব দেবকুমার সরকার। রঘুনাথপুর মহকুমার এই সভা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। একইভাবে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই এই সভাতে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আগামী বৃহত্তর লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানায় এই জমায়েত।

মালদা

গত ৯ জুন '১৫ তারিখে অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে স্থানীয় মকদমপুর এলআইসি অফিসের সামনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মালদা জেলার জমায়েত ও বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে। সভায় দাবি প্রস্তাব পেশ করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ বাঘিড়া, প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সুবীর রায়, সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রমাপদ চ্যাটার্জি এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর। উক্ত কর্মসূচীতে প্রায় ৪৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়া

ঐদিন বাঁকুড়া জেলায় উক্ত কর্মসূচী বেলা ১.৩০ মিনিটে সমিতি ভবনের সামনে চার শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অস্বাভাবিক দাবদাহ উপেক্ষা করে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার কর্মসূচী প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

রাজ্য জুড়ে জমায়েত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

সফল করে তুলেছেন জেলায় কর্মচারী বন্ধুরা। এই কর্মসূচীতে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও উদ্যোগ গ্রহণ করায় কর্মসূচীর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গেছে। জেলা জমায়েতের ৬ দফা দাবি পাঠ করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক তপন চক্রবর্তী দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অতনু মজুমদার সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও ১২ই জলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক পার্থ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলার স্থায়ী সভাপতি ধর্মদাস ঘটক।

এছাড়া ৪ জুন বিষ্ণুপুর মহকুমা ও খাতড়া মহকুমায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন কর্মচারী বন্ধু। দুটি জায়গাতেই কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়।

হাওড়া

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা সদরে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে ৯ জুন ২০১৫ ছুটির পর কর্মচারীদের জমায়েতের মাধ্যমে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশকে কেন্দ্র করে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কাজ পরিচালনা করেন দিপালী পোড়েল ও বিভাস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে সদরের ব্লক ও সেক্টর থেকে কর্মচারীরা সংগঠিতভাবে জমায়েতে উপস্থিত হন। সভার শুরুতে প্রয়াত সদস্য, কর্মী, নেতৃত্বসহ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভার প্রারম্ভেই ৬ দফা দাবিসহ মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন জেলা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অমল বিশ্বাস। তিনি ছ'দফা দাবিসহ প্রস্তাব বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ পেশ করেন।

এরপর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অসিত দাস। এবং জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক বিমল লাহিড়ী। উভয় বক্তাই বর্তমান অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ সমস্ত দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আরো বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবেশে কর্মচারীদের জমায়েত ছিল উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় এই কর্মসূচীর পূর্বে ৫-৭ মে ২০১৫ ব্লক স্তর অবধি কেন্দ্রীয় সফরসূচী ও অ্যাপ্রন পরিধান এবং বিভিন্ন স্থানে ৮ মে অফিস গেটে বিক্ষোভ সভা এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

অনুরূপভাবে উক্ত কর্মসূচী উলুবেড়িয়া মহকুমা সদরে গত ৫ জুন '২০১৫ উলুবেড়িয়া মহকুমার শাসকের দপ্তরের সামনে ছুটির পর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে প্রায় ৬০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভার কাজ পরিচালনা করেন আতরসিং বাল্মিকী মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহকুমা সম্পাদক দিবাকর ধর। এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহকুমা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত প্রধান।

উত্তর দিনাজপুর

উত্তর দিনাজপুরে জেলা জমায়েতের কর্মসূচী দুটি জায়গায় প্রতিপালিত হয়। প্রধান কর্মসূচীটি হয় রায়গঞ্জে। এখানে কর্ণজোড়া বাস স্ট্যান্ডে কর্মচারীদের জমায়েত একটি সুসজ্জিত মিছিল (বডি পোস্টার পরিহিত অবস্থায়) অফিস পাড়ায় বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা সমাহর্তার করণের নিকট এসে জমায়েত হয়। সেখানে বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করেন জেলা সভানেত্রী মাধবী দেবনাথ। দাবিসমূহ পাঠ করেন সহ সম্পাদক শিবেশ সিন্‌হা, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক দীপক চ্যাটার্জি। এখানে মোট ৪১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মহিলা কর্মচারী ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা জমায়েতের অপর কর্মসূচীটি ইসলামপুর পৌর বাস স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণ মণ্ডল, সরলা সোরেন, চন্দন সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী এখানকার সভা পরিচালনা করেন। দাবিসমূহ পাঠ করেন মহকুমা সম্পাদক রথীন দাস এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ-সম্পাদক মহিউদ্দীন আহমেদ। এখানে মোট ১৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মহিলা কর্মচারী ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

বীরভূম

জমায়েতের কর্মসূচী শুরুর পূর্বে তিন শতাধিক কর্মচারী বন্ধুর এক বর্ণাঢ্য মিছিল জেলা প্রশাসন ভবন লাগোয়া শহীদ বেদী স্থলে উপস্থিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বীরভূম জেলা সভাপতি কমল দত্ত। দাবি সনদ পাঠ করেন যুগ্ম-সম্পাদক পরিমল কর্মকার। দাবি সনদকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় এবং তিনি আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য সদস্য বন্ধুদের তৈরি থাকার আহ্বান জানান। সমগ্র কর্মসূচীতে মহিলা সদস্য বন্ধুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মসূচীর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক জওহরলাল জানা। সমগ্র কর্মসূচীটি বীরভূম জেলার কর্মচারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মচারী জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর শহরের প্রধান পোস্ট অফিসের সামনে। বেলা ২টোর সময় শুরু হওয়া এই জমায়েত কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি বীরেন মণ্ডল। অন্যতম সহ সম্পাদক অরুণ মজুমদার ছয় দফা দাবি পেশ করেন। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক বীরেন রায়, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দুলাল দত্ত। পরিশেষে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক আশিষ বাগচী বক্তব্য রাখেন। তিনি আগামী ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জমায়েতে সহস্রাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

সংগঠন তহবিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ঐ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মধ্যেও ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ধর্মঘট করার হিম্মৎ দেখিয়েছিল কোন সংগঠন? রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এরপর ১৯৭৭-২০১১, দীর্ঘ ৩৪ বছর প্রশাসনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অনুকূল গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কর্মচারী স্বার্থেই সর্বোতভাবে ব্যবহার করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, চারটি বেতন কমিশন, ধর্মঘটের অধিকারসহ অসংখ্য দাবি-দাওয়া অর্জিত হয়েছে এই সময়ে। কর্মচারীদের জীবন-মানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী স্বার্থবাহী দৃষ্টিভঙ্গীকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বাস্তবোচিত দাবি সনদ একের পর এক প্রস্তুত করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কর্মচারী স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েও রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি দাবিসনদ ছিল ভারসাম্যমূলক। কোনো অবাস্তব চটকদারি স্লোগান হাজির করে কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করেনি সংগঠন। দাবি এমন উত্থাপন করতে হবে যা আদায়যোগ্য এবং তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলবে পারস্যুয়েশন প্রয়োজনে লড়াই, আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী। সংগঠনের এই অকপট মনোভাবই কর্মচারী সমাজে তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। সংগঠনও কর্মচারীদের আস্থাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে।

এখন পরিস্থিতি আবারও প্রতিকূলতার দিকে বাঁক নিয়েছে। অর্জিত অধিকার আক্রান্ত। নেমে আসছে অগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক আক্রমণ। এই অবস্থায় আবারও রাস্তায় নেমেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। মিছিল সমাবেশে অবস্থান, ডেপুটেশন, লাগাতার গণঅবস্থান, পত্রের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রভৃতি গণতন্ত্রের প্রতিটি মাধ্যমকেই ব্যবহার করা হচ্ছে নিরলসভাবে। প্রায় প্রতিদিনই কর্মচারী স্বার্থ রক্ষায় রাস্তায় নামছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কিন্তু গত চার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, বর্তমান প্রশাসনের যা চরিত্র, তাতে কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করার জন্য আরও বৃহত্তর আন্দোলন প্রয়োজনে ধর্মঘটের পথেই যেতে হবে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিলের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে এই বাংলার বুকে। অনড় প্রশাসনকে কিভাবে ধাক্কা দিতে হয়, তা জানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কর্মচারী স্বার্থে তৎপরতা প্রদর্শনের যে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য তার প্রজ্বলিত মশালকে বহন করবই আমরা। সমস্ত হুমকি আর চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা না করেই। আর এই বৃহত্তর লড়াইয়ের সফল মঞ্চ প্রস্তুত করার আবশ্যিক শর্ত হল শক্তিশালী তহবিল। কারণ পর্যাপ্ত তহবিল ব্যাতীত সাংগঠনিক ও আন্দোলনের কর্মসূচী পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই সংগঠনের বিনম্র আহ্বান কর্মচারী বন্ধুদের কাছে—সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করুন। অতীতে কখনোই সংগঠনকে ফেরাননি কর্মচারীরা। আমরা নিশ্চিত এবারেও ফেরাবেন না। আসন্ন দুর্বার লড়াইয়ের ভিত্তি রচিত হোক সফল তহবিল সংগ্রহ অভিযানের মধ্য দিয়ে। □

ঋণের রেকর্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সঞ্চয়ের টাকা ঋণ হিসাবে বামফ্রন্ট সরকারের উপর চাপত এবং সেটাই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঋণের সিংহভাগ। বর্তমান সরকারের সেই বাধ্যবাধকতা একেবারেই নেই। এছাড়াও চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে। পূর্বে এই হার ছিল ৩২ শতাংশ।

তাহলে এত পরিমাণ ঋণ নিতে হচ্ছে কেন? এর প্রধান কারণ হল রাজস্ব আয় বৃদ্ধি না পাওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ বৃদ্ধি পাওয়া। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে পূর্বতন সরকারের থেকে পিছিয়ে আছে বর্তমান সরকার। বামফ্রন্টের শেষ বছর ২০১০-১১-তে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৫ শতাংশ। সরকার পরিবর্তনের পর তা ক্রমহ্রাসমান। ২০১৩-১৪-তে এই পরিমাণ কমে হয়েছে ৯ শতাংশ। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি কমছে।

এতসত্ত্বেও ২৩ জুন '১৫ পুনরায় বাজার থেকে ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ঋণ গৃহীত হয়েছিল ২১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ এপ্রিলে ১০০০ কোটি টাকা, ২৬ মে ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। তথ্য বলছে এই জুন মাসে ১১টি রাজ্য ঋণ নিচ্ছে, সর্বাধিক ১৬০০ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে আছে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত চার বছরে বর্তমান সরকার বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে ৮৬ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালে বাজার থেকে সংগৃহীত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া স্বল্প সঞ্চয় খাতে কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী ঋণ ৭৯ হাজার কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতের ৭০ শতাংশ হিসেবে ঋণের পরিমাণ ১২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এছাড়াও নাবার্ড সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য থেকে ঋণ ৮২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে শেষ লগ্নে যে টাকা দেয় তা খরচ করতে না পারলে পরের আর্থিক বছরে ঋণ হিসাবে ঢুকে যায়, তার পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের পুঞ্জীভূত ঋণ। এইসব নিয়ে সামগ্রিকভাবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার সময় রাজ্যের পুঞ্জীভূত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকার মতো। বর্তমান তৃণমূল সরকারের চার বছরে বাজার থেকে নেওয়া ঋণের মোট পরিমাণ বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের ঋণের থেকে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। ২০১১ সালে মোট পুঞ্জীভূত ঋণের প্রায় ৬০ শতাংশ বর্তমান সরকার ছুঁয়ে ফেলেছে মাত্র চার বছরেই। সত্যি ঋণ গ্রহণের নতুন রেকর্ডের পথে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। কিন্তু এত টাকা ঋণ নেওয়ার পরেও তার কোনো সুফল সাধারণ মানুষ বা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পাচ্ছেন না। □

মানস কুমার বড়ুয়া

২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও ফেডারেশন সমূহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৯ জুন '১৫ অফিস ছুটির পর মৌলালি যুব কেন্দ্রে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন ছাড়াও ১২ই জলাই কমিটি, মার্কেনটাইল ফেডারেশন, বি এস এন এল-এর নেতৃবৃন্দ আগামী ২ সেপ্টেম্বর '১৫-এর দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সমর্থন জানানোর লক্ষ্যে উস্থিত ছিলেন। এই কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। তিনি বলেন ফ্যাক্টরি আইন, ঠিকা শ্রমিক আইন, ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধনের মাধ্যমে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন, বহু ঘাম রক্তের বিনিময়ে অর্জিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কেড়ে নিতে চাইছে। এর আগেও অনেক কেন্দ্রীয় সরকার এই শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রমিক কর্মচারীদের দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে তারা অর্জিত অধিকারসমূহ কেড়ে নিতে পারেনি। দেশে নয়া উদার আর্থিক নীতি চালু হওয়ার পর থেকে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বরের সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সংগঠন ও পতাকা নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রুজি রক্ষার স্বার্থে এক নয়া ইতিহাস রচনা করবে। আগামী তিনটি মাস এই লক্ষ্যেই সমস্ত সংগঠনগুলি নিবিড় প্রচার সংগঠিত করবে।

কনভেনশন পরিচালনা করেন শ্যামল চক্রবর্তী, রমেন পাণ্ডে, এ এল গুপ্ত, অতনু চক্রবর্তী, সনৎ লাহিড়ী, অশ্বিনী সাহা, তাপস ভট্টাচার্য ও নীহারেন্দু দত্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী উল্লেখ করেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মচারীদের এই লড়াই কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নয়, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও এই লড়াই। রাজ্যে একটার পর একটা চটকল, বড়-মাঝারি, শিল্প, চা-বাগানে মালিকপক্ষ লকআউট ঘোষণা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবারও মালিকদের ডেকে কারখানা খোলার জন্য বলছে না। শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘট ডাকলে রে রে করে তেড়ে আসছে। রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ ও গুণ্ডা লেলিয়ে দিচ্ছে ধর্মঘট ভাঙার জন্য। এবার মুখ্যমন্ত্রী যুদ্ধ চাইলে শ্রমিক কর্মচারীরা অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এই যুদ্ধে জয় আমাদের নিশ্চিত।

এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন আই এন টি ইউ সি নেতা রমেন পাণ্ডে। তিনি বলেন শ্রমিক কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বোনাসে সিলিং থাকবে কিন্তু মালিকদের মুনাফার কোনো সিলিং থাকবে না, এ কোন উন্নয়ন। এই উন্নয়ন কার স্বার্থে? শ্রমিক শ্রেণীকে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে। দেশের সমস্ত অংশের শ্রমিক কর্মচারীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই ২ সেপ্টেম্বরের সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সফল করবে।

১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহবায়ক সমীর ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে দেশে এবং রাজ্যে ধর্মঘটের ভাষায় কথা বলা ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। আসন্ন ধর্মঘটের সফলতার মধ্য দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা চালাবে, কিন্তু আগামী তিন মাস ঐক্যবদ্ধ প্রচারের মধ্য দিয়েই ধর্মঘটকে সাফল্যের শীর্ষে উপনীত করতে হবে শ্রমজীবী মানুষকে।

এই কনভেনশনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে রণজিৎ গুহ, টি ইউ সি সি-র পক্ষে নরেন চ্যাটার্জী, ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে মিহির চন্দ, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে দিলীপ ভট্টাচার্য। বি এম এস-র পক্ষে নীহারেন্দু দত্ত এবং এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে বাসুদেব বসু। সকলেই আগামী ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচার আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

● দাবিসমূহ ●

১। শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকের অধিকার হরণ করে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা প্রচলনের চক্রান্ত বন্ধ করো। ৪৩, ৪৪ এবং ৪৫তম ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। সীমাহীন বেকারি রোধ করে সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে হবে।

৪। মূল্য সূচকের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৫,০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন দিতে হবে।

৫। অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল, আশা ও প্যারা টিচার সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্প সমূহে নিযুক্ত সকল কর্মীকে শ্রমিকের অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য অবসরকালীন সুনিশ্চিত পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। হকারদের জন্য প্রণীত আইন অবিলম্বে প্রয়োগ করতে হবে।

৮। স্থায়ী কাজে ঠিকাপ্রথা বন্ধ করা সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতনের ভিত্তিতে সকল ঠিকা শ্রমিককে স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে।

৯। শ্রম আইনগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে শ্রমিকের অধিকারের আইনানুগ মান্যতা দিতে হবে।

১০। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ বন্ধ করো।

১১। বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের যোগ্যতা সীমা প্রত্যাহার করতে হবে। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

১২। আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। আই এল ও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮ ভারত সরকারকে মান্যতা দিতে হবে। □

সুব্রত গুহ

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 2nd Issue, June 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

বিভিন্ন সমিতির আন্দোলনের কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন

মিছিল ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস দেবব্রত দাশগুপ্ত এবং তাপস সেনকে নিয়ে গঠিত

এস ই এস এ-র সাধারণ সম্পাদক মানব পাল

অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে বিগত ১২ জুন ২০১৫ কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে মিছিল— এরপর রানী রাসমনি রোডের কেন্দ্রীয় সমাবেশে হাজির থাকলেন সারা রাজ্য থেকে আগত সহস্রাধিক কর্মরত ও দুই শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারসহ প্রায় সবকটি ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের একাধিক প্রতিনিধি।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের মূল কারিগর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের উপর নেমে আসা দমনমূলক বদলী বন্ধ করতে, বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ ৮ দফা জরুরী দাবিতে বিগত তিন মাস ব্যাপী রাজ্যের জেলা / মহকুমা স্তরে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সাধারণ সভার মাধ্যমে জেলা জমায়েত করে প্রস্তাব গ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশনের পর এই কেন্দ্রীয় সমাবেশের আহ্বান করা হয়।

কেন্দ্রীয় সমাবেশের আগে চার শতাধিক সদস্য বন্ধুর বর্ণাঢ্য স্লোগান মুখরিত উদ্দীপ্ত মিছিল এন্টালি মার্কেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড দিয়ে এসে রানী রাসমনি রোডের মূল সমাবেশে যোগদান করে বেলা ২টোয়। অর্ধ দিবস বা পূর্ণদিবস ছুটি নিয়েই সদস্য বন্ধুরা এই সমাবেশকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যান।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জি, সহ সভাপতি চতুষ্টয় যথাক্রমে কমল দাম, নীরজ ঘোষ, সভাপতিমণ্ডলী। শোক প্রস্তাবসহ কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে সভা শুরু হয়। সমাবেশের মূল দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুমনকান্তি নাগ। দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল। সমিতির দাবিগুলির প্রতি সহমত জানিয়ে এবং দাবি আদায়ে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার আশ্বাস দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহসম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা। তিনি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে গোটা রাজ্যে কর্মচারী সমাজের ওপর আক্রমণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাহরণ সহ আগামী দিনের লড়াই সংগ্রামে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল হওয়ারও আহ্বান রাখেন।

দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে যুগ্ম সম্পাদক সুমনকান্তি নাগ দৃপ্ত ভঙ্গিতে সকলকে লড়াইয়ের ময়দানে শামিল হয়ে অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালনের আহ্বান রাখেন। নেতা কর্মীদের জড়তা কাটিয়ে সংগ্রামী মেজাজেই পরিস্থিতির আক্রমণকে মোকাবিলার আহ্বান জানান। একই সাথে ৮ দফা জরুরী দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্রে পাল বলেন যে, সাব-অ্যাসিস্ট্যান্টদের মাথা নিচু করা অতীতেও যেমন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যায়নি। বর্তমানেও বিভেদকামীদের সহযোগিতা নিয়ে প্রশাসনের একাংশ আমলাদের পক্ষ থেকে যত চেষ্টাই হোক, সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা মাথা নত করবেন না। চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেই সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করার শপথ এই সমাবেশ থেকেই সকলকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে দাবি প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব তথা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমিতির নেতৃত্বে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের অতীতে গৌরবজনক লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেন। মূল কর্মচারী আন্দোলন থেকে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বিচ্ছিন্ন করার অতীতের বহু উদ্যোগসহ গেজেটেড স্ট্যাটাসকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার সমিতির ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে বর্তমান সময়ের যে লড়াই তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। সমিতিকে ভাঙ্গার জন্য অতীতের বিভেদকামীদের বর্তমানে 'খোচড়' ভূমিকাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলার আহ্বান জানান। একই সাথে দেশের সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সহ দেশের সম্পদ ধনীদের হাতে তুলে দেওয়ার যে নির্দেশ পালনকারী ভূমিকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে, তার স্বরূপ উন্মোচিত করে সামগ্রিক লড়াই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সারা দেশব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন এবং অর্ধ শতাধিক ফেডারেশনের যৌথ আহ্বানে যে ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে। তাকে সর্বাত্মক সফল করার প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবেশে সমিতির প্রবীণ নেতৃত্বরা মিছিলসহ সমগ্র কর্মকাণ্ডে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। দাবি প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গ্রহণের পর সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

অশোক রায়

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন

বিক্ষোভ সভা ও গণডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১০ দফা দাবিতে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে সমিতিগত কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সভা এবং গণডেপুটেশনের কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে সংগঠিত হল। সমিতির মূল পরিকল্পনা ছিল এই সভা নবান্নের সন্নিকটে মন্দিরতলা বাস স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে এবং সেইমতো হাওড়া পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে ১৯ মে '১৫ প্রাথমিক অনুমতিও পাওয়া যায়। একেবারে শেষ পর্যায়ে গত ৯ জুন '১৫ পূর্ণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু মুখ্য-সচিবকে ঐ দিন দুপুর ১টা নাগাদ ১১ জুন '১৫ বেলা ১টা থেকে ২টোর মধ্যে ডেপুটেশন প্রদানে সময় চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবান্নের টনক নড়ে এবং রাত ৭-৩০ মিঃ জানানো হয় যে ঐ স্থানে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় সভা করা যাবে না। অথচ আই বি সদর দপ্তর এবং হাওড়া কমিশনারেট আগে বহুবার সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও এই কথা বলেননি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের পক্ষে বার বার অনুরোধ করা হয় যে, 'আপনারা হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে সভা করতে চাইলে আমরা অনুমতি প্রদান করব'। লিফলেট-পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নবান্ন সহ সর্বত্র ব্যাপক প্রচার হওয়ায় সমিতি প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ১০ জুন '১৫ বিকাল ৪টের সময় বাধ্য হয়ে ঐ স্থানে সভা করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই স্থান পরিবর্তনের সংবাদ সর্বত্র জানাতে বেশ অসুবিধা হয়। তা সত্ত্বেও প্রায় ৪০০ জন কর্মচারী ঐ সভায় উপস্থিত থেকে জানিয়ে দিলেন যে সচিবালয় এবং সন্নিকট দপ্তরগুলির কর্মচারীরা সরকারের স্বেচ্ছাচারী অবস্থান মেনে নিচ্ছেন না।

সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশনের পর বেলা ৩টের সময় প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস এবং সমর্থন

সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস

করে বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক সুদীপ পাল। তাঁদের বক্তব্যে একদিকে যেমন কর্মচারীদের উপর আর্থিক এবং অধিকারগত বঞ্চনা ও স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র বিরোধিতা করা হয় তেমনিই লোকসেবা আয়োগ অকার্যকর করে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার, টাইপিস্ট ক্যাডার অবলুপ্তির সরকারি সিদ্ধান্ত, উদ্দেশ্যমূলক নিয়মবহির্ভূত বদলি, লোকসেবার মাধ্যমে অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি বিরোধিতায় বা দাবিতে বক্তা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রাখেন। একই সঙ্গে সামাজিক বিষয় হিসেবে মহিলাদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ও কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার দাবি উত্থাপিত হয়। দোহ অধিকার-এর কর্মচারীদের বেআইনী ভাবে ডিপ্লয়মেন্ট-এর বিরোধিতা করে দুগ্ধ প্রকল্পের সামাজিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে দুগ্ধ উৎপাদনের সরকারী ব্যবস্থা বজায় রাখার দাবি করা হয়।

এদিন সমিতির কেন্দ্রীয় সভায় প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য বলেন, যে রাজ্যের সচিবালয়ে কর্মচারীদের দাবিদাওয়াগুলি শুধু দাবি সনদে ঠাঁই পায়নি, বাইরের আক্রান্ত মানুষের দাবিও যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার সচিবালয়ের কর্মচারীসহ সমস্ত কর্মচারীদের ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। আমলাতান্ত্রিক আক্রমণ নামিয়ে আনছে কর্মচারীদের উপরে। রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে বদলি করা হচ্ছে কর্মীদের। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে পারেনি সরকার পরন্তু সরকারী নীতিতেই ঘটছে মূল্যবৃদ্ধি। ফলে কর্মচারীদের বেতনের ক্ষয় ঘটছে। অথচ বেতনের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য মহার্ঘ্যভাতাও দিচ্ছে না। একইভাবে কেন্দ্রের সরকারও শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী আইন তৈরি করছে। তেলের দাম বিশ্ববাজারে কমলেও বাস্তবে তা বেশি দামেই কিনতে হচ্ছে আমাদের। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকারই ভয়ঙ্কর শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী সরকার। এমনটা দীর্ঘদিন চলতে পারেনা। এর বিরুদ্ধে গোটা কর্মচারী সমাজকে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম আন্দোলনের পথেই থাকতে হবে। সাংবিধানিক সংস্থা পি এস সি-র কর্মপরিধি খর্ব করার লক্ষ্যে দুই শতাধিক পদ অবলুপ্ত করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। যোগ্য চাকুরী প্রার্থীদের বঞ্চিত করছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের স্থল পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে সোচ্চার হন এবং বলেন যে সরকার কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার অধিকারের কথা না ভাবলে কর্মচারীরা বড় ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নিজেদের অধিকার রক্ষা করবেন। □

মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে সংবর্ধনা

২০১৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র সুরজিৎ লোহারকে সংবর্ধনা দিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বাঁকুড়া জেলা শাখা। গত ২৪-৫-১৫ তারিখ রবিবার সন্ধ্যাবেলায় পূর্ত দপ্তরের সরকারী আবাসনে এই কৃতী ছাত্রকে সংবর্ধিত করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক অতনু মজুমদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ধর্মদাস ঘটক, সহ-সম্পাদক সুনীল মাহাতো, কোষাধ্যক্ষ সত্যপ্রিয় দাসগুপ্ত, দপ্তর সম্পাদক যদুনাথ মুখার্জিসহ আরো অনেক কর্মচারী।

বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র সুরজিৎ রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৮৪ নম্বর পেয়েছে। আগামী দিনে তার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা। পিতা পূর্ত বিভাগের কর্মচারী ও মাতা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। বাবা মায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ছেলের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই ফলাফল বাঁকুড়া জেলার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষকে গর্বিত করেছে। □

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

রক্তদান কর্মসূচী ও কেন্দ্রীয় জমায়েত

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (ওয়েস্ট বেঙ্গল)-এর দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্যোগে প্রধান দমকল কেন্দ্রে গত ২৪ জুন ২০১৫ রক্তদান কর্মসূচী পালিত হয়। ৬৩ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এবং ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (ওয়েস্ট বেঙ্গল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ১২ দফা দাবিকে সামনে রেখে এক জমায়েতের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উৎপল দাস ও স্বপন দাস সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন। সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ তালুকদার প্রস্তাব পেশ করেন প্রস্তাবের পক্ষে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিতোষ নন্দী বক্তব্য রাখেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সহ সম্পাদক বিজয় শংকর সিনহা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিসহ সামগ্রিক বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।